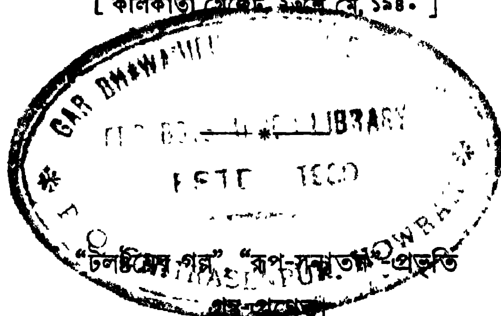
ছেলেদের ভক্তমাল

গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ২০শে মে, ১৯৪০]



"টলষ্টয়ের গল্প", "রূপ-সনাতন" প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

প্রণীত



আট আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর য়্যাণ্ড্ সন্স্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা
৩৮নং জন্‌সন্ রোড্—ঢাকা

চতুর্থ সংস্করণ
১৩৪৭

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জ্জী
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

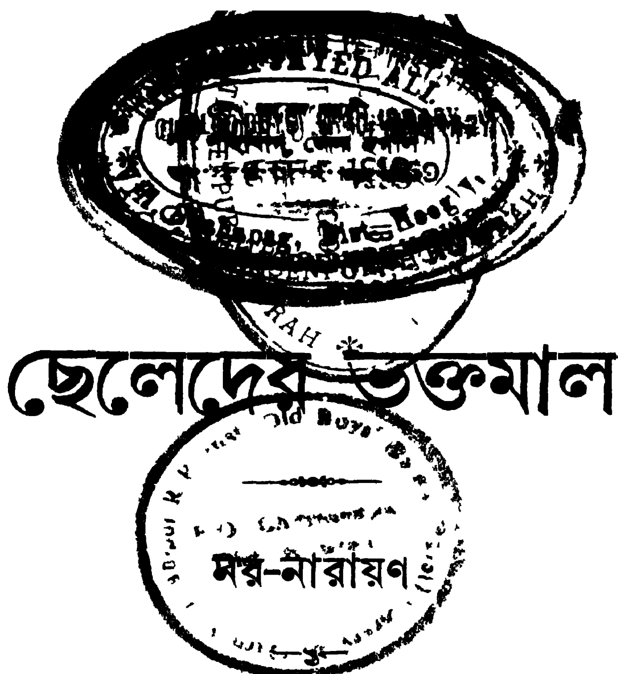
নিবেদন

বাংলার নরনারীর চিরসমাদৃত ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে "ছেলেদের ভক্তমাল" রচিত। ইহার কতকগুলি গল্প বিভিন্ন সময়ে "শিশু-সাথী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাদের কল্যাণ-কল্পে এই পুস্তক লিখিত, তারা ইহা পাঠ করিয়া যদি নিজেদের মন একটুও সরল, শুভ্র ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে তবেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী, ১[illegible]৪০

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র



ছেলেদের ভক্তমাল

নর-নারায়ণ

ত্রিলোচন বণিকের যথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিল; কিন্তু তিনি আর তাঁর স্ত্রী ছাড়া ঘরে আর কেউই ছিল না। ছেলে-মেয়ে কেউ না থাকায় ঘরটা যেন একেবারে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হইত। বাড়ীতে সাধু, সন্ন্যাসী বা অতিথি আসিলে তাঁরা দুইজনেই তাঁকে দেবতার মত সেবা করিতেন। বাকী সময় সংসারের কাজকর্ম্ম এবং ভগবানের নাম লইয়া কাটিত। এমনি করিয়া তাঁদের দিন যাইতেছিল।

একদিন তাঁদের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল—অতি দরিদ্র এক বালক। বালকের কাপড় ছেঁড়া-ফোঁড়া, মুখখানা

অতি মলিন—বিষণ্ণ, যেন কতদিন তার না হইয়াছে নাওয়া, আর না হইয়াছে খাওয়া। তাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া



"এখানে দাঁড়িয়ে কেন বাবা ?"

ত্রিলোচন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে দাঁড়িয়ে কেন বাবা ? কিছু চাই কি তোমার ?"

—"আমার বাপ-মা কেউ নেই, আমি বড়ই দুঃখী। আপনি একটু দয়া কর্‌লে আমি বেঁচে যাই।"

—"তোমার কি নাম বাবা ?"

—"আজ্ঞে আমার নাম অন্তর্য্যামী।"

বালকের নিতান্ত দুঃখের দশা দেখিয়া বণিকের মন গলিয়া গেল। খুব স্নেহের স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন কাজটাজ কর্‌তে পার কি ?"

—"আজ্ঞে পারি।"

—"কি কাজ কর্‌তে পার ?"

—"যা হুকুম কর্‌বেন।"

—"বেশ কথা। কত মাইনে চাও ?"

—"মাইনে আমায় কিছুই দিতে হবে না। টাকা নিয়ে কি কর্‌ব ? আমার ত কেউই নেই। আমি পেটে-ভাতেই খুব খুশী হ'য়ে থাকৃব'খন।"

—"বেশ! তুমি আমার এখানেই থাক। আমার ঘরে অতিথি আসেন, বহু সাধু পায়ের ধূলো দেন, তুমি তাঁদেরই সেবা-যত্ন কর্‌বে। কেমন ?"

—"আজ্ঞে আচ্ছা।"

—২—

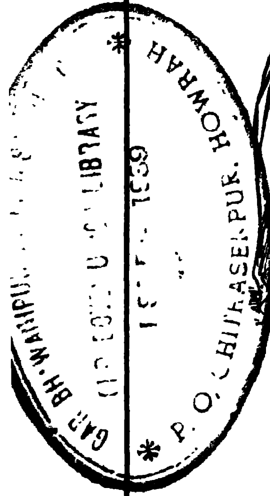
কিছুদিন যায়। সে সকলের সেবা করে। সাধুরা আসেন, তার ব্যবহার ও যত্নে মুগ্ধ হন। তার স্বভাবটি যেমন ঠাণ্ডা, চালচলনও তেমনি নেহাৎ সাদাসিদে। ত্রিলোচনও তাকে ঘরের ছেলেই মনে করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তার প্রতি এতই ভালবাসা জন্মিল যে, খানিকক্ষণ না দেখিলেই ত্রিলোচনের মনটা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িত। পুত্র ছিল না, এই বালকের প্রতি অসীম স্নেহই তাঁর শূন্য বুক পূর্ণ করিয়া দিল।

ত্রিলোচনের স্ত্রীও যে অন্তর্য্যামীকে খুব ভালবাসিতেন না তা নয়; কিন্তু সে খুব বেশী খাইত বলিয়া একটু বিরক্ত হইতেন। এক এক দিন সে এতই বেশী ভাত খাইয়া ফেলিত যে, আর কিছুই থাকিত না। কাজেই ত্রিলোচনের স্ত্রীকে প্রায়ই না খাইয়া থাকিতে হইত।

একদিন বিকালবেলা ত্রিলোচনের স্ত্রী পাড়ার এক বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। সেখানে এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছেন। তাঁদের সঙ্গে নানা কথায় তিনি বলিলেন,—"কি বল্‌বো দিদি, আমার বাড়ীতে এক অদ্ভুত ছেলে এসেচে! ছেলেটি এদিকে খুব ভালই বটে, কিন্তু খায় যেন রাক্ষসের মত। বেশী খায় ব'লে চা'লও বেশী নেই; কিন্তু এক-একদিন তিন-চার জনের ভাত-ডাল-তরকারী সে একলাই খেয়ে ফেলে। প্রায়ই খেতে পাই নে—আবার রাঁধ্‌তেও ইচ্ছে করে না।"

পাড়ার স্ত্রীলোকেরা এই খাওয়া লইয়া নানাভাবে নানা কথা কহিতে লাগিল।





পাড়ার স্ত্রীলোকেরা নানাভাবে নানা কথা কহিতে লাগিল



অন্তর্য্যামী বাড়ীতে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দিন শেষ হইল, রাত্রি আসিল। কিন্তু কোথায় সে? ত্রিলোচনের মন অস্থির হইল। কি এক ব্যথা তাঁর সমস্ত বুকে বাজিয়া উঠিল। তাঁর স্ত্রীরও খুবই দুঃখ হইল, ভাবিলেন—'তাই ত! না হয় দুটো বেশীই সে খেয়েছে, না হয় মাঝে মাঝে আমি খেতেই পাই নি। কিন্তু ওর অভাবে আজ যে সমস্ত বাড়ীটাই একেবারে ফাঁকা-ফাঁকা ঠেক্‌চে।'

তিনিও মনে মনে খুবই ব্যথা অনুভব করিলেন।

ত্রিলোচন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। রাত্রি বেশী হইল। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাঁকে খাওয়ানো গেল না। সে রাত্রি ত তাঁর অনাহারে অনিদ্রায়ই কাটিয়া গেল। তার পরদিনও তিনি উঠিলেন না, কিছু খাইলেনও না। তার পরদিনও এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। তাঁর স্ত্রীও না খাইয়া পড়িয়া রহিলেন। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া তাঁর বড়ই ভয় হইল।

তিন দিনের দিন রাত্রে ত্রিলোচনের সবেমাত্র একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, এমন সময় তিনি এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। ভগবান যেন তাঁকে বলিতেছেন,—"দুঃখ ক'রো না ত্রিলোচন, আমিই তোমার কাছে ঐ অন্নহীন অনাথের বেশে গিয়েছিলুম। জেনে রেখো—অনাথ, আতুর,

অন্ধ, অসহায়ের সঙ্গেই আমি থাকি, তাদের সেবাই আমার সেবা।”

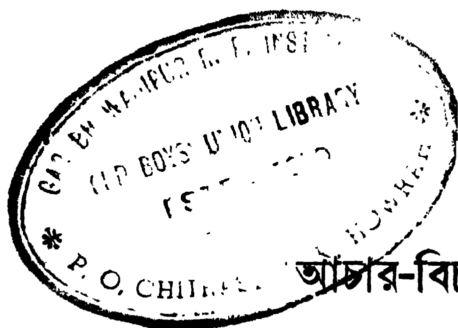
ত্রিলোচন বলিলেন,—“আমি ত তোমার সেবা কর্‌তে পারি নি। আমার অপরাধ মাপ কর ঠাকুর।”

উত্তর হইল,—“না, তোমার কোন অপরাধই হয় নি, আমি খুশীই হয়েছি।”

—“তবে দয়া ক’রে আমায় একবার দেখা দাও—তোমায় দেখে আমার জীবন ধন্য করি।”

উত্তর হইল,—“আমি তোমার অন্তরেই আছি। যখনই আমায় নিবিষ্টচিত্তে ভাব্‌বে তখন তোমার ভিতরেই দেখ্‌তে পাবে।”

ত্রিলোচনের অন্তরটি পুলকে ভরিয়া গেল; তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁর দুই চক্ষু দিয়া অঝোরে জল ঝরিতে লাগিল।



আচার-বিচার

—১—

মাড়োয়ার দেশ। বেলা দুপুর। এক পথিক চলিয়াছেন অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ভিতর দিয়া। গায়ে তাঁর গেরুয়া কাপড়, গলায় মালা। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম আর ধূলা। বিশ্রাম, আর কিছু আহারের তাঁর নিতান্তই দরকার হইয়াছে। চলিতে চলিতে তিনি দূরে এক মন্দির দেখিতে পাইলেন।

মন্দিরের দাওয়ায় বসিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বিগ্রহ রহিয়াছেন। পূজাও শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূজারী সেখানে নাই। আশে-পাশের লোক তাঁকে দেখিয়া বুঝিল—তিনি একজন সাধু। তারাও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাদের কাছেই তিনি শুনিলেন যে, করমাবাঈ নামে এক নারী সেই মন্দিরে ঠাকুরের সেবা করেন, তাঁর ভক্তির কথা মাড়োয়ার দেশের সকল লোকেই জানে। একটু পরেই করমাবাঈ স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই ফিরিয়া আসিলেন। সাধুকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মা, মনে হচ্ছে তোমার পূজো হ'য়ে গেছে, এখন নেয়ে এলে কেন? তবে কি তুমি এখন ভোগ রেঁধে দেবে?"

করমাবাঈ বলিলেন,—"না বাবা, ভোগ দেওয়া হ'য়ে গেছে।"

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি তুমি পূজো হ'য়ে গেলে আবার স্নান কর ?"

করমাবাঈ উত্তর দিলেন,—"না বাবা, আমি একবারই স্নান করি। সকালে উঠেই রেঁধে ঠাকুরকে খাওয়াই।"

সাধু দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন,—"এ্যাঁ! তুমি কাপড় না ছেড়েই ঠাকুরের জন্য রান্না কর ?"

করমাবাঈ বলিলেন,—"হ্যাঁ বাবা, আমার জগন্নাথ যে ক্ষিদেয় বড় কষ্ট পান, তাঁর কষ্ট মোটেই সহ্য করতে পারিনে ; তাই কাপড় না ছেড়েই তাড়াতাড়ি রেঁধে তাঁকে খাইয়ে সুস্থ করি।"

সাধু বলিলেন,—"এ যে ঘোর অনাচার! ছি ছি! এমনি ক'রে কি ঠাকুরের সেবা করতে আছে ?"

বড়ই অপরাধ করিয়াছেন মনে করিয়া করমাবাঈ অতি কাতরভাবে বলিলেন,—"আমি জ্ঞানহীনা নারী, আচার-বিচারের কিছুই জানি নে। আমার অপরাধ হয়েচে, আপনি দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা করুন। আর আমি স্নান না ক'রে ঠাকুরের সেবা করতে যাব না। আপনারও বড়ই কষ্ট হচ্ছে, এই দারুণ রোদ্দুরে এতটা পথ চ'লে এসেছেন। এখন দয়া ক'রে স্নান সেরে আসুন, আমার ঠাকুরের প্রসাদ না নিয়ে যেতে পারবেন না।"

সাধুর পেটে তখন আগুন জ্বলিতেছে। যদিও এই অনাচার দেখিয়া তাঁর মনটা কি রকম হইয়া গিয়াছিল, তবু তিনি স্নান করিতে গেলেন। এদিকে করমাবাঈ তাড়াতাড়ি সাধুর জন্য ভোগ প্রস্তুত করিলেন। সাধু তা' গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলেন।

কি করিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে হয়, আচার-বিচার কাকে বলে, নানা শাস্ত্র থেকে বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া করমাবাঈকে বুঝাইয়া দিয়া সাধু বিদায় লইলেন।

—২—

কিছুদিন যায়। করমাবাঈ আর ভোরে উঠিয়াই ঠাকুরের ভোগ রাঁধিতে যান না। এখন তিনি ঘরের সব কাজ সারিয়া স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরের সেবায় মন দেন, কাজেই ঠাকুরের সেবা এখন খুব বেলায় হয়। সাধুর উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, আচার-বিচারের দিকে এখন তাঁর নজর খুব বেশী। বেলা হয় আর ভাবেন—ঠাকুরের বুঝি বড়ই কষ্ট হইতেছে। তিনি যে ঠাকুরকে নিজের ছেলের মতই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, কিন্তু আচার-বিচার রক্ষার জন্য তাঁকে বাধ্য হইয়াই দেরী করিতে হইত।

সাধু মাড়োয়ার থেকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন; মন্দিরের কাছে পড়িয়া থাকিয়া কেবল ভগবানেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাইত রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, স্বয়ং জগন্নাথ কাছে আসিয়া তাঁকে বলিতেছেন—"দেখ্, তোর দেওয়া ভোগ খেতে আমার বড্ড দেরী হ'য়ে যায়। আমার খাওয়াই হয় না। মাড়োয়ার দেশে করমাবাঈ আমায় যে ভোগ রেঁধে দেয়, তা না খেয়ে আমি আস্‌তে পারি নে, সে যে আমায় ছেলের মত ভালবাসে। সে সকালে উঠেই তাড়াতাড়ি আমায় রেঁধে দিত, তাই খেয়ে আমার ক্ষিদে মিট্‌ত। আজকাল সে বড্ড দেরী কচ্ছে। আমার ভারি কষ্ট হয়।"

এই কথা বলিয়াই ঠাকুর অদৃশ্য হইলেন। সেবাইতের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। একটি ভাবনাই তাঁর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল—হায় রে! ঠাকুর আমার ক্ষুধায় কষ্ট পান্। সমস্ত রাত্রি তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাহিলেন।

ভোর হইতেই কথাটা চারিদিকে রটনা হইয়া পড়িল। সেই সাধুর কানে কথাটা যাইতেই তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ধরিয়া কে যেন খুব জোরে একটা মোচড় দিয়া দিল। তিনিই যে আচার-বিচারের কত শুষ্ক উপদেশ করমাবাঈকে দিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর দুই চোখ দিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি উঠিয়া গিয়া সেবাইতকে সব কথা বলিলেন।

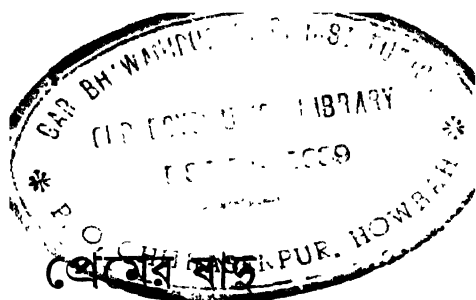
* * *

প্রায় একমাস পরে একদিন করমাবাঈ ঠাকুরের সেবা করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইবেন—এমন সময়েই দেখিলেন, সেই সাধু মন্দিরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাঁর গালের উপর দিয়া চোখ থেকে জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

করমাবাঈ তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে বাবা? আমি কি আবার কোন অপরাধ করেচি?"

সাধু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি যে ঠাকুরকে কি রকম ভালবাস, তোমার অন্তর যে কত পবিত্র, তুমি যে সত্যই দেবী, তা বুঝ্‌তে না পেরে তোমাকে আচার-বিচার মান্‌তে উপদেশ দিয়ে আমি মহাপাপ করেচি। তোমার কাছে ক্ষমা চাই মা। তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী, আমিই অবোধ। কালকে থেকে আগের মতই ভোরে উঠে' ঠাকুরকে রেঁধে দিও। কি ভাগ্যবতী তুমি মা! তোমার হাতে না খেয়ে ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রের ভোগও গ্রহণ করেন না। আজ বুঝেছি—

অন্তর যার শুদ্ধ তাহার বাহ্য আচার মিছে।"



প্রেমের যাদু

—১—

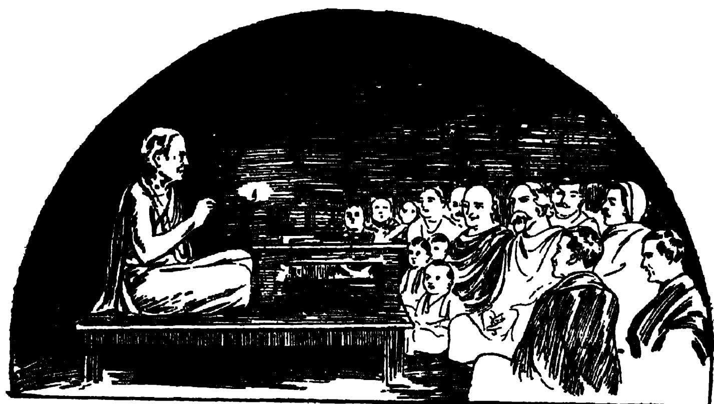
এক পল্লীগ্রামে বহু লোক বাস করে। ধনী গৃহস্থও সেখানে কম নয়। একদিন এক গৃহস্থ ব্যবসা করিয়া বহু টাকা লইয়া ঘরে আসিল। সে একটা থলেতে করিয়া টাকাগুলি খুব গোপনে এক জায়গায় রাখিয়া দিল।

সেই গ্রামের এক চোর গোপনে গোপনে ইহা লক্ষ্য করিল। রাত্রে যখন সকলে ঘুমে অচেতন হইয়া আছে, ঠিক সেই সময়ে সেই চোর প্রাচীর টপ্‌কাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং টাকার থলেটি লইয়া চম্পট দিল।

ভোরে টাকার থলে দেখিতে না পাইয়া গৃহস্থ রাজদরবারে খবর দিল। রাজকর্ম্মচারীরা গ্রামের দাগী চোরদের ধরিয়া লইয়া গেল, তাদের বাড়ী খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু টাকা ত পাওয়াই গেল না, আর তারা যে চুরি করিয়াছে এমন কোন প্রমাণও পাওয়া গেল না। কাজেই কাকেও ধমকাইয়া আর কাকেও বা দুই-এক ঘা বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। প্রকৃত চোর ধরিবার জন্য রাজা গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। গোয়েন্দাপুলিশ ছদ্মবেশে নানা জায়গায় চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

চোর ভাবিল, যখন গোয়েন্দা পিছনে লাগিয়াছে, আর তার উপর যখন রাজকর্ম্মচারীদের একটু সন্দেহও আছে, তখন একদিন না একদিন সে ধরা পড়িবেই। তার বড়ই ভয় হইল, কিন্তু কি যে করিবে কিছু ঠিক করিতেও পারিল না।

এমনি করিয়া দুই-এক দিন ত কাটিয়া গেল। একদিন এক জায়গায় এক কথক ঠাকুর কথকতা করিতেছেন, আর



কথক ঠাকুর কথকতা করিতেছেন

অনেক পুরুষ ও নারী সেখানে বসিয়া একমনে ভক্তির কথা শুনিতেছে। চোর ভাবিল,—'এত লোক ত কথা শুন্‌চে, গিয়ে না হয় আমিও একটু শুনি।' সেখানে গিয়া শুনিল, কথক ঠাকুর বলিতেছেন,—"যত মানুষ আমরা দেখি এদের অনেকেই কিন্তু প্রকৃত মানুষ নয়। মানুষের অন্তরে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, সব ভুলে গিয়ে সে যখন ভগবানকেই চায়, তখনই

তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। অতএব মানুষের উচিত প্রকৃত মানুষের কাছে দীক্ষা নিয়ে ভগবানে মন-প্রাণ অর্পণ করা, তবেই সে নতুন মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে, তার পুনর্জ্জন্ম হবে।"

চোর ভাবিল,—'আমিও যদি ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা নেই তবে আমারও ত সব পাপ-তাপ দূর হ'য়ে যাবে, আমিও ত নতুন মানুষ হব, আমারও ত পুনর্জ্জন্ম হবে। তবে আর কেন? সব ছেড়ে দিয়ে আমি এখুনি দীক্ষা নেব।'

আর একটু কালও দেরী না করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক সাধু পুরুষের দর্শন মিলিল। তাঁকে প্রণাম করিয়া সে বলিল,—"ঠাকুর, ভগবানের অসীম দয়ায় আজ আপনার শ্রীচরণ দর্শন কর্‌লুম। আমার বড়ই ইচ্ছে যে, আপনার শিষ্য হ'য়ে জীবন ধন্য করি। দয়া ক'রে আমায় এখুনি দীক্ষা দিন।"

সাধু বলিলেন,—"বেশ। তোমার যদি একান্তই ইচ্ছে হ'য়ে থাকে তবে কাল্‌কে এসো, আজ আর থাক।"

চোর বলিল,—"না ঠাকুর, মন্তর আমি আজই চাই। আমি আর এক মুহূর্ত্ত দেরী কর্‌তে পারি নে। যতক্ষণ না দেবেন আমি আপনার পা ছাড়্‌ব না।"

সাধু আর কি করেন? মন্ত্র দিলেন। চোর মনে করিল তার নূতন জন্ম হইয়াছে, সে নূতন মানুষ হইয়াছে। সে সব ভুলিয়া একমনে একপ্রাণে ভগবানের চিন্তাই করিতে লাগিল।

—২—

এদিকে গোয়েন্দাপুলিশ ত সন্ধান করিতে করিতে সেই চোরকেই ধরিল। চোর কোন আপত্তি করিল না। তাকে রাজার কাছে হাজির করা হইল। রাজা বিচার করিয়া বলিলেন,—"আমার রাজ্যে চোরের সংখ্যা বড্ড বেশী হয়েচে, চুরি কিছুতেই বন্ধ কর্‌তে পাচ্ছি নে। কাজেই এই চোরকে এমন শাস্তি দেব যাতে সব চোরের ভয় হয়। আমি একে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলুম।"

এই বলিয়াই তিনি জল্লাদদের হুকুম দিলেন,—"এই চোরকে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়াও।"

চোর বলিল,—"মহারাজ, যদি হুকুম হয়, আমি একটা কথা বলি।"

রাজা বলিলেন,—"বল।"

চোর বলিল,—"মহারাজ, আমি এজন্মে চুরি করি নি। যদি আপনার ইচ্ছা হয় পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

শূল ত হইবেই, একবার না হয় পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাক, এই ভাবিয়া রাজা বলিলেন,—"কি পরীক্ষা দিতে চাও?"

চোর বলিল,—"যা বল্‌বেন মহারাজ।"

রাজা তাঁর কর্ম্মচারীদের হুকুম দিলেন,—"একটা লোহার ডাণ্ডা পুড়িয়ে লাল ক'রে নিয়ে এসো ত।"

অমনি কয়েকজন লোক ছুটিয়া গিয়া কামারশালা থেকে লোহা পোড়াইয়া লইয়া আসিল।

রাজা চোরকে বলিলেন,—"ধর দেখি এই লাল টক্‌টকে



সে লোহার ডাণ্ডাটা ধরিল···

লোহাটা। যদি হাত না পোড়ে তবে তোমার কথাই সত্যি।

একবার মনে-প্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া সে লোহার ডাণ্ডাটা ধরিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তার হাত পুড়িল না! সমস্ত লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইল।

রাজা ভাবিলেন,—'এ লোক ত চোর হ'তেই পারে না, এ যে মহাপুরুষ! এমন মানুষকেও গোয়েন্দা চোর ব'লে ধ'রে এনেচে! যদি একে শূলে দেওয়া হ'ত, তবে কি সর্ব্বনাশই হ'ত।'

রাজার যত রাগ গিয়া পড়িল গোয়েন্দার উপর। তিনি শেষে গোয়েন্দারই প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন।

চোর তখন করজোড়ে রাজাকে বলিল,—"মহারাজ, গোয়েন্দার কোন অপরাধ হয় নি। সত্যই আমি চুরি করেছিলুম, তবে এজন্মে নয়, পূর্ব্বজন্মে।"

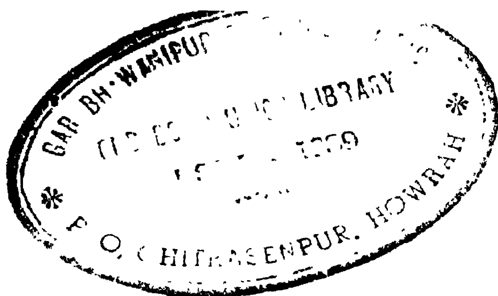
তারপর কি করিয়া তার পুনর্জ্জন্ম হইল, কি করিয়া সে নূতন মানুষ হইয়াছে, সকলই সে একে একে বলিল।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গোয়েন্দাকে ক্ষমা করিলেন।

চোর সেই থেকে হইল মহাসাধু।

"এমনি হরির অহেতু করুণা—প্রেমের এমনি যাদু,
কয়লা-হৃদয় গলি' হীরা হয়, তস্করও হয় সাধু।"





বিশ্বাসের জয়

—১—

জুনাগড় নগরে একজন লোক বাস করিতেন। তাঁর নাম নরসী। তাঁর স্বভাব-চরিত্র খুবই ভাল ছিল, কিন্তু টাকা-পয়সা রোজগারের ক্ষমতা একেবারেই ছিল না। ভাই তাঁকে খাইতে দিতেন, কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণাও কম দিতেন না; বিশেষতঃ ভাইয়ের স্ত্রী তাঁকে যখন তখনই যা-তা বলিতেন।

একদিন নরসীর বড়ই পিপাসা পাইয়াছে, তাড়াতাড়ি বৌদির কাছে গিয়া জল চাহিলেন। বৌদি জল ত দিলেনই না, অধিকন্তু যা-তা বলিয়া গালাগালি দিলেন। তাঁর প্রাণে বড়ই লাগিল, ভাবিলেন—এর চেয়ে বনে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করাও ঢের ভাল। এই ভাবিয়া তিনি এক বনে চলিয়া গেলেন।

গভীর বন, সূর্য্যের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। চলিতে চলিতে দূরে একটি শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন; সেখানে গিয়া সাতদিন ধরিয়া কিছু না খাইয়া পড়িয়া রহিলেন। সাতদিন পরে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া কাছে আসিয়া বর দিতে চাহিলেন। কি বর চাহিবেন—নরসী

প্রথমে তাহা ঠিক করিতেই পারিলেন না; শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, যদি দয়াই কর্‌লে, তবে আমার অন্তরে ভক্তি দাও।"

মহাদেব খুব খুশী হইয়া সেই বরই দিলেন।

এবার নরসী শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া, মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিয়া তাঁর মন মোহিত হইয়া গেল। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ দেখিয়া ভাবের আবেগে তিনি উন্মত্ত হইয়া গেলেন। কিছু দিন গেল। নরসী দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর ভাব-গতিক দেখিয়া সকলে তাঁকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। তিনি তা'তে মনই দিলেন না।

নরসীর সংসারে তাঁর মাত্র তুইটি কন্যা—আর বড় কন্যার এক পুত্র। একদিন তাঁর বড় কন্যাটি বলিল,—"বাবা, আমার বড় ইচ্ছা যে, এখন তুমি তোমার নাতির বিয়ে দাও। নাত-বৌ আস্‌বে, তোমার সেবা কর্‌বে। তুমি একটি মেয়ে দেখে বিবাহ স্থির কর।"

নরসী বলিলেন,—"মা, আমি কি কর্‌তে পারি? সবই শ্রীকৃষ্ণ কর্‌বেন। তাঁকে ডাকা ছাড়া আর যে কিছুই আমি জানি না মা।"

মেয়ে তখন আর কি করিবে? সে মনে করিল এমন বাপের উপর নির্ভর করিয়া থাকায় কোন ফল হইবে না। কাজেই সে নিজেই এক মেয়ে দেখিয়া বিবাহ স্থির করিল।

বিবাহের মাত্র দুই দিন বাকী আছে। ক'নের আত্মীয়স্বজনরা বলাবলি করিতে লাগিল—নরসীর ঘরে না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র, তার ঘরে আবার বিবাহ! নরসীর মেয়ে এসব শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, নরসীর কাছে গিয়া বলিল,—"বাবা, বিয়ের ত মোটে দুই দিন বাকী, তুমি এখনও যা হোক্ একটা কিছু ব্যবস্থা কর, নইলে যে আর মুখ দেখানো যাবে না।"

নরসীর তবুও খেয়াল নাই। তিনি ভগবানের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন।

দুইটি দিন কাটিয়া গেল। বিবাহের দিন আসিল—নরসী নির্ব্বিকার। তাঁর মেয়ে হাহাকার করিতে লাগিল। এদিকে হইল কি!—স্বয়ং শ্রীহরি মানুষের বেশে আসিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। লোকজন তিনিই লইয়া আসিলেন। সকলে মনে করিল যে, নরসীই সমস্ত আয়োজন করিতেছে। নরসীকে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন লোক একটি হাতী সাজাইয়া লইয়া আসিল। নরসী একটি কথাও না বলিয়া হাতীর পিঠে চাপিয়া হরিনাম গাহিতে গাহিতে চলিলেন এবং মহাসমারোহে কন্যাকর্ত্তার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

যারা তাঁকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, তারা এখন বরের জাঁকজমক দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। বিবাহের আসরে নরসী কেবল হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন বর-বধূ লইয়া

অবিরাম হরিনাম করিতে করিতে নরসী বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

—২—

পুত্রের বিবাহ দিয়া নরসীর বড় মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী গেল। শ্বশুরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সংসার চলে না। তাই শ্বশুর-শাশুড়ী বলিল,—"বৌ-মা, তুমি ত সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছ, তোমার বাবাকে একটু ব'লে দেখ, তিনি কিছু সাহায্য কর্‌তে পারেন কি না।"

বৌ-মা ত তার বাপের কথা খুব ভাল রকমই জানে। তবু শ্বশুর-শাশুড়ীর তাড়নায় বাপের কাছে লোক পাঠাইল। নরসী শুনিয়াও শোনেন না। মেয়ের কাছ থেকে আবার লোক আসিল, কিছুই হইল না। আবারও লোক আসিল, বলিল,—"কিছু দিতে পারুন বা না-ই পারুন একবার গিয়ে আপনার মেয়েকে দেখে আস্‌বেনই।"

এই কথা শুনিয়া নরসী করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে মেয়ের বাড়ী চলিলেন। তিনি যেভাবে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া হরিনামে বিভোর হইয়া উন্মত্তের মত মেয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তাতে মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী অত্যন্ত হতাশ হইল। তারা তাঁকে একটা ভাঙা চালা-ঘরে থাকিতে দিল। সেখানে তুলসীপাতা আর ফুল লইয়া নরসী পূজা করিতে বসিলেন। এমন সময় ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ফুল ও

তুলসীপাতা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নরসীর প্রার্থনায় তাঁর ঘরে জলপড়া বন্ধ হইল, ভক্তের কষ্ট ভগবান সহ্য করিতে পারেন না। বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হইতে লাগিল! নরসীর মেয়ে আসিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা বলিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"তাদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখ—কি চায়।"

মেয়ে গিয়া তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিল। তারা চটিয়া উঠিল, বলিল,—"তোমার বাবাকে বলগে ছুটো পাথর দিতে।"

একেই ত নরসীকে তারা নিতান্ত অবহেলা করিতেছিল। তাতেই তাঁর মেয়ে লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে মরিয়া যাইতেছিল, এর উপর এই জবাব বাপকে গিয়া সে কি করিয়া বলিবে? যাই হোক্ সে গিয়া বলিল,—"বাবা, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী ছুটো পাথর চেয়েছেন আর পাড়াপড়শীদের প্রত্যেককে এক একখানা কাপড় দিতে বলেচেন।"

কাপড় দেওয়ার কথাটা সে নিজের মন থেকে বলিয়াছিল।

নরসী বলিলেন,—"তাই দেব, এ আর বেশী কথা কি।"

ভগবানে যাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাঁকে যিনি মনপ্রাণ সমস্ত দিয়াছেন, তাঁর বাসনা অপূর্ণ থাকে না, ভগবানের দয়া তিনি নিশ্চয়ই পান।

ভগবানেরই অনুগ্রহে নরসীর সঙ্গে সেখানেই বৃন্দাবনের শ্যামল সাহা নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হইল।

শ্যামল সাহা একজন ভক্ত বৈষ্ণব। নরসী তাঁকে সব কথা জানাইলেন। শ্যামল সাহা বৃন্দাবন থেকে গাড়ী বোঝাই করিয়া একটি সোনা দিয়া মোড়া ও একটি রূপা দিয়া মোড়া পাথর আর কতকগুলি খুব ভাল ভাল কাপড় পাঠাইয়া দিলেন।

মেয়ের ইচ্ছামত নরসী পাড়ার প্রত্যেককে এক একখানা কাপড় ও মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেই পাথর দুইটি দিলেন। সকলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাঁর কাছে মাথা নোয়াইল।

তারপর মেয়েকে লইয়া নরসী নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। মেয়েও তখন থেকে বাপের কাছে থাকিয়া একমাত্র সাধন-ভজনে মন দিল।

ভক্তের ভগবান

—১—

বামদেব দরিদ্র গৃহস্থ। কাপড়ে ফুল, কল্কা, লতাপাতার ছাপ দেওয়া ছিল তাঁর ব্যবসায়। এতে যা কিছু সামান্য আয় হইত, তাই দিয়া তিনি সংসার চালাইতেন। কিন্তু টাকা-পয়সা ছিল না বলিয়া তাঁর মনে কোন দুঃখ ছিল না, মনে মনে সব সময়ে সকল কাজের মধ্যেই তিনি ভগবানের চিন্তা করিতেন, আর এই চিন্তায় মহা-আনন্দের মধ্যে তাঁর জীবন কাটিতেছিল।

সংসারে তাঁর এক বিধবা মেয়ে আর মেয়ের একটিমাত্র ছেলে। ছেলেটির নাম নামদেব।

বাড়ীতে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ আছেন। বামদেব পূজা করেন আর নামদেব চাহিয়া থাকে, তারও পূজা করিবার ভারি সাধ হইল। একদিন সে বলিল,—"দাদা মশাই, আমি পূজো কর্‌ব। আমায় পূজো কর্‌তে দাও না কেন?"

বামদেব বলিলেন,—"তুমি এখনও ছোট, এখন তোমার পূজো কর্‌বার দরকার নেই ভাই।"

নামদেব চুপ করিয়া রহিল।

কিছুদিনের মধ্যেই এক জরুরী কাজে বামদেবকে দুই-তিন দিনের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইল। তখন বাধ্য

হইয়াই তিনি নামদেবের উপর পূজার ভার দিলেন। নামদেবের মনে আনন্দ আর ধরে না। সে এতদিন যা চাহিয়াছে অথচ পায় নাই, আজ অযাচিতভাবেই তা পাইয়াছে ; কাজেই আহ্লাদে আটখানা হইয়া সে পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তার মা পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন, আর সে নিজেই গিয়া দুধ জ্বাল দিয়া আনিয়া ঠাকুরের সাম্‌নে রাখিয়া পূজায় বসিল। কিন্তু সে না জানে মন্ত্র, না জানে পূজার কোন নিয়ম। পূজায় বসিয়া বলিল,—"ঠাকুর, আর ত কিছুই নেই, যা এনেছি খাও।"

ঠাকুর যেমন ছিলেন তেমনি রহিলেন, একটু নড়িলেনও না। নামদেবের বড়ই দুঃখ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কত কাকুতি-মিনতি করিল, ঠাকুর তবু নড়িলেন না। সরল বালক তখন এক একবার রাগ করে, এক একবার অভিমান করে। কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তার প্রাণ যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। বড় দুঃখেই সে তখন বলিল,—"ঠাকুর, দাদু তোমাকে রোজ খাবার দেয়, তুমি খাও, আর আমি দিলেই বুঝি তুমি খেতে পার না? তোমাকে ব'লে দিচ্ছি—এবার যদি না খাও তোমার সাম্‌নেই আত্মহত্যা কর্‌ব।"

ঠাকুর তবু নড়িলেন না। এবার নামদেব সত্য সত্যই যেমন আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইল, অমনি বিগ্রহ জীবন্ত



আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইল

হইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। নামদেবের কি আনন্দ! দাদা মহাশয়ের জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিয়া নিজে প্রসাদ লইল, আর মাকেও দিল।

দুই-তিন দিন এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। বামদেব ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না। নামদেব তখন বলিল,—"দাদু, আমি কেন তোমায় মিছে কথা বল্‌ব? সত্যই ঠাকুর আমার হাতে খেয়েচেন।"

বামদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই আমাকে দেখাতে পারিস্?"

নামদেব বলিল,—"হ্যাঁ দাদু, আমি তোমায় দেখাতে পারি। কাল্‌কেই তোমায় দেখাব।"

পরদিন বামদেব দেখিলেন সত্য সত্যই শ্যামসুন্দর হাসি-মুখে খাইতেছেন। বামদেব নিশ্চল নিস্তব্ধ! খানিক পরে উঠিয়া নামদেবকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"আজ আমার জীবন ধন্য, কত জন্মের কত পুণ্যের ফলে তোমায় পেয়েছি ভাই! আজ থেকে তুমিই আমার গুরু।"

দেশময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। দলে দলে লোক নামদেবকে রোজ দেখিতে আসিতে লাগিল।

—২—

নামদেবের কথাটা ক্রমে ক্রমে বাদশার কানে গেল। তিনি ভাবিলেন—'তাকে এনেই দেখা যাক্ না কথাটা কত-

দুর সত্য।' তাই তিনি নামদেবকে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাইলেন। তারা ত নামদেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। নামদেব বলিল,—"আমার মত লোকের কি আর বাদশার কাছে যাওয়া সাজে?"

বাদশার লোকেরা বলিল,—"আমরা যদি তোমাকে না নিয়ে যেতে পারি আমাদের বিপদ ঘট্‌বে।"

নামদেব কাজেই তাদের সঙ্গে গিয়া বাদশার দরবারে হাজির হইল। বাদশা তাকে বলিলেন,—"শুন্‌তে পাচ্ছি তুমি বালক হ'য়েও মস্ত সাধু পুরুষ হয়েচ। যদি সাধু পুরুষই হ'য়ে থাক, তবে আমার সাম্‌নে কিছু কেরামৎ দেখাও দেখি।"

নামদেব বলিল—"জাঁহাপনা, আমি সাধু পুরুষ নই, কেরামৎ কি ক'রে দেখায় তাও জানি নে। যদি জান্‌তুম, তা হ'লে কি আমরা কাপড়ে ছাপ দিয়ে পেট চালাই?"

বাদশা বলিলেন,—"আমার আদেশ—তোমাকে কেরামৎ দেখাতেই হবে।"

নামদেব বলিল,—"আমি পার্‌ব না, জাঁহাপনা।"

তখন বাদশা হুকুম দিলেন,—"ওকে বন্দী কর।"

বালক নামদেব বন্দী হইয়া কয়েদখানায় রহিল, আর একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। এমনি করিয়া কয়েক দিন গেল। বাদশার বাড়ীর একটি বাছুর মারা গেল। বাদশা তখন কয়েদখানা থেকে নামদেবকে আনাইয়া

বলিলেন,—"দেখ, গাভী তোমার পূজ্য। এই দেখ, বাছুরটি মারা গেছে, এতে গাভীটির বড়ই কষ্ট হচ্ছে। এখন বাছুরটিকে বাঁচিয়ে দিয়ে গাভীর দুঃখ দূর কর দেখি।"

নামদেব আর কি করে? মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সে বাছুরটির গায়ে হাত বুলাইল, বাছুরের দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

এইবার বাদশা খুব খুশী হইলেন এবং পুরস্কার দিতে চাহিলেন, কিন্তু নামদেব পুরস্কার লইল না। অনেক বলিয়া কহিয়া বাদশা তাকে খুব মূল্যবান্ একটি পালঙ্ক এবং একটা বিছানা দিয়া বলিলেন,—"তুমি প্রকৃতই সাধু, তুমি যদি এই বিছানায় শোও, তা হ'লেও আমার সাধুসেবা হবে।"

বাদশার প্রাসাদ হইতে নামদেব বিদায় লইল। পথে এক নদীর কাছে গিয়া পালঙ্ক, বিছানা ইত্যাদি এক টান মারিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। প্রবল স্রোতে সব ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাদশার লোকেরা তাকে বাদশার কাছে লইয়া গেল। সব শুনিয়া বাদশা তাকে বলিলেন,—"সাধু, তুমি এম্‌নি ক'রে আমার অপমান কর্‌লে কেন?"

নামদেব কহিল,—"না জাঁহাপনা, আমি আপনার অপমান করি নি। দয়া ক'রে আমার সঙ্গে লোক দিন, আপনার সমস্ত জিনিস তুলে দিচ্ছি, কিন্তু আমি কিছুই নেব না।"

বহু লোকজন তার সঙ্গে গেল। সত্য সত্যই নদীর যেখানটায় সে সব জিনিস ফেলিয়াছিল, ঠিক সেইখান থেকেই

তুলিয়া দিল। সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল নামদেব সেখান থেকে বাড়ীতে চলিয়া গেল।



খুব দূরদেশ থেকে এক বণিক একদিন নামদেবের কাছে আসিয়া বলিল,—"সাধু, আমি তুলাদান কর্‌ব ইচ্ছা করেচি, আর এই উপলক্ষে সাধুদের কিছু সোনা দান কর্‌ব স্থির ক'রে আপনার কাছে এসেচি। আপনার মত মহাপুরুষ যদি আমার দান গ্রহণ না করেন, তবে আমার তুলাদানই ব্যর্থ হবে।"

নামদেব অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর দান গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া বলিল,—"আমি একটা সর্ত্তে আপনার দান নেব। একটা তুলসীপাতার ওজনের একটু সোনা আমি নিতে পারি।"

বণিক তাঁর দেশে চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে নামদেব সেখানে গেল। মানদণ্ড আনিয়া এক দিকে একটি তুলসীপাতা আর একদিকে তুই-তিন রতি সোনা দেওয়া হইল, কিন্তু তুলসীপাতার ওজন বেশী হইল। আরও সোনা দেওয়া হইল, আরও—তবুও তুলসীপাতার ওজনই বেশী হইল। শেষে বাড়ীর মেয়েদের গয়না, এমন কি প্রতিবাসীদের ঘরে যে সোনা ছিল তাও আনিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কিছুতেই তুলসীপাতার সমান ওজন হইল না। বণিক তখন

নামদেবের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন, এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নামদেব বলিল,—"কোটি কোটি জগৎ ভগবানেরই এক একটি ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ, অভিমানে তাঁকে পাওয়া যায় না, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে তাঁকে মিলে না। তুমি পাঁচ পাঁচ মণ সোনা এনেচ, এ সোনায় কি হবে? এ দ্বারা কি তাঁকে পাওয়া যাবে? ভুল—ভুল—এ সবই ভুল।"

বণিকের মন ফিরিয়া গেল। পৃথিবীর এ ঐশ্বর্য্যের শক্তি যে কিছুই নয়, তিনি তা ভাল করিয়া বুঝিলেন এবং সেই দিন হইতে বৈষ্ণব হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

—৪—

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির। রোজ পূজা হয়। কাঁসর-ঘণ্টা বাজে, আরতি হয়, কত লোক দেখে। কীর্ত্তন হয়, কত লোক শোনে। নামদেবও প্রত্যহ আরতির সময় এই মন্দিরে যায়।

একদিন মন্দিরে খুব ভীড় হইয়াছে। নামদেব তার জুতা জোড়া কাপড় দিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখিল। তা জানিয়া পূজারী ব্রাহ্মণগণ ও অন্য সেবকগণ ভয়ানক রাগিয়া উঠিল। মন্দিরে এত বড় অনাচার! তারা নামদেবকে গলাধাক্কা দিয়া মন্দিরের বাহির করিয়া দিল। নামদেব রাগ করিল না, মন্দিরের পিছনে গিয়া বসিল, আর একমনে হরিনাম

গান করিতে লাগিল। একটু কালের মধ্যেই দেখা গেল, শ্রীরঙ্গনাথজীর মূর্ত্তি নামদেবের দিকেই ফিরিয়া আছে। দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।



মন্দিরের পিছনে

এবার পূজারী ব্রাহ্মণগণ ও অন্য সকলে বুঝিল যে, বাইরের আচার-বিচার মিথ্যা, অন্তরের সরল শুদ্ধ ভক্তি দিয়াই ভগবানকে পাওয়া যায়; তাই চিরদিনই **ভক্তের ভগবান**।

পাপের ভোগ

—১—

তখন বর্দ্ধমান জেলার মানকর গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। মানকরের শিবরাম বাঁড়ুয্যেই ছিলেন সেখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা। তাঁর বিনা সম্মতিতে ব্রাহ্মণেরা সেখানে কোনও বিশেষ কাজ করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁর গৃহে সকল সময়েই গ্রামের ব্রাহ্মণগণ আসিতেন এবং সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ে নানা আলোচনা করিতেন।

তখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম্ম সারা বাংলায় এক বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। একদিন এই প্রেম-ধর্ম্ম লইয়াই শিবরাম বাঁড়ুয্যের গৃহে ব্রাহ্মণগণ নানা আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে আলোচনা চরমে উঠিল এবং প্রায় সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময়েই এক বৈষ্ণব গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অতিথি দেবতাস্বরূপ, তাঁর যত্ন না করিলে মহাপাপ, কাজেই শিবরাম তাঁকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন।

বৈষ্ণবকে দেখিয়া অন্য ব্রাহ্মণগণ চুপ করিলেন বটে, কিন্তু ছুইটি যুবক তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিল। প্রথমে

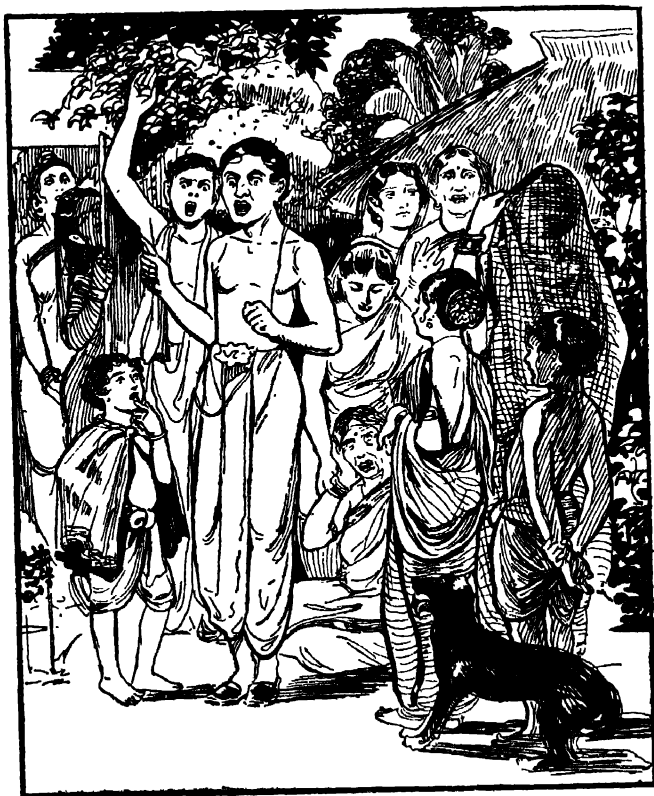
যে সব প্রশ্ন করা হইল, বৈষ্ণব খুব বিনীতভাবে হাসিমুখে তার উত্তর দিলেন। কিন্তু যারা ধর্ম্ম কাকে বলে জানে না—সত্য সত্যই ভগবানকে ভালবাসে না, তারা শুধু তর্কের জন্যই তর্ক করে, আর তারাই যে সকলের চেয়ে বেশী জানে ও বোঝে—এইটি জাহির করিতে চায়। বাজে তর্কে নহে, ভগবানকে পাওয়া যায়—ভক্তিতে—প্রাণের টানে। এ টান যার নাই, সে শুধু তর্কই করে, তার অন্তরে কোন দিনই দেবতার স্থান হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হইল।

যুবক দুইটি বেয়াড়া তর্ক জুড়িয়া দিল। বৈষ্ণবটি কথা কাটাকাটি না করিয়া চুপ করিয়াই রহিলেন। শেষে তারা সেই বৈষ্ণবকেই যা তা বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিল। কিন্তু তিনি দুঃখিতও হইলেন না, তাদের উপর রাগও করিলেন না। তা সত্ত্বেও উদ্ধত যুবক দুইটি থামিল না। তখন তারা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরই নিন্দা করিতে লাগিল। বৈষ্ণবের বহু অনুনয় সত্ত্বেও তারা থামিল না।

সহ্য করিবারও একটা সীমা আছে। বৈষ্ণব অনেক সহ্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহাপ্রভুর নিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁর প্রাণে বড়ই লাগিল। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাতে সেখানকার অন্য ব্রাহ্মণেরাও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা শিবরাম বাঁড়ুয্যে বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—বৈষ্ণবকে কোন খানে দেখা গেল না।

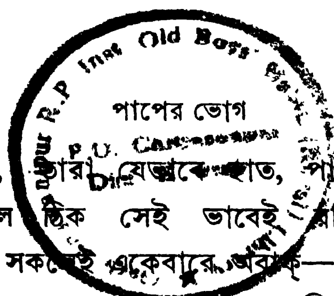
—২—

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। অতিথি বৈষ্ণবটি যেমনই বাহির হইয়া গেলেন অমনি দেখা গেল, অবিশ্বাসী



ব্রাহ্মণ দুইটি······নিশ্চল হইয়া গেল

তার্কিক ব্রাহ্মণ দুইটি একেবারে পাথরের মত নিশ্চল



হইয়া গিয়াছে, তারা যেভাবে হাত, পা ও মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছিল ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে! তাদের অবস্থা দেখিয়া সকলেই একেবারে অবাক্—হতভম্ব! এ কি ভয়ানক কাণ্ড! তারা না পারিতেছে নড়িতে, না পারিতেছে কোন কথা কহিতে!

মুহূর্ত্তমধ্যেই গ্রামময় এই অদ্ভুত ঘটনার কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যে শোনে সে-ই ছুটিয়া দেখিতে আসে। আসিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকে।

কথাটা ক্রমে যুবক দুইটির বাপ-মা'র কানেও গেল। তাঁরা বাড়ী থেকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলেদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁরা ডাকিতে লাগিলেন, ছেলেরা শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে।

এই অবস্থা দেখিয়া বাপ-মা'র বুক যেন ফাটিয়া যাইতে-ছিল, তাঁদের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাঁদের অবাধ্য হইয়াছিল। অনর্থক তর্ক করিয়া, গালাগালি দিয়া মানুষের মনে—সাধুপুরুষদের প্রাণে ব্যথা দিতে কতবারই না বারণ করিয়াছেন, কিন্তু তারা কোন দিনই সে সব কথা শোনে নাই। সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত! বাপ-মা এই সব ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল। তখন সকলেই বলিল যে, সেই বৈষ্ণবের অনুগ্রহ ছাড়া ইহার আর কোন প্রতীকার নাই।



বৈষ্ণবের খোঁজে নানা দিকে নানা লোক ছুটিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক দূরে এক গাঁয়ে তাঁর দেখা পাওয়া গেল। একে একে সকলেই তাঁর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। বৈষ্ণব তো ক্ষমার অবতার, ক্ষমা না করিলে ব্রাহ্মণ যুবক দুইটি যে মারা যায়! তাদের বাপ-মা'র কান্নার কথা শুনিয়া তাঁর প্রাণ দয়ায় গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"ভয় নাই, এর উপায় আছে। প্রেমের অবতার পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে শরণ নিলেই —ভগবানকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌লেই, তাঁরই অনুগ্রহে সকল পাপ-তাপ, সব দুঃখ-যন্ত্রণা দূর হ'য়ে যাবে। আপনারা এখন এক কাজ করুন। আপনাদের গাঁয়ের কাছে যে তালপুকুর আছে, সেই পুকুরের পাড়ে এক বৈষ্ণব আছেন, তাঁর কাছে যান। আমার কি শক্তি আছে বলুন ত? তাঁর চরণামৃত খাওয়ালে ব্রাহ্মণ দু'টি এখনই ভাল হ'য়ে যাবে। আপনারা সেখানেই যান, উদ্বেগের কোন কারণ নাই।"

ব্রাহ্মণেরা সেই কথা শুনিয়া একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"সে কি! সেই বৈষ্ণব যে জাতিতে ডোম! আমরা যে তার ছোঁয়া জলটুকুও ছুঁই না, তারই চরণামৃত খাওয়াতে হবে!"

বৈষ্ণব কানে আঙ্গুল দিয়া জিভ্ কাটিয়া বলিলেন,—"অমন কথা বল্‌বেন না, ওকথা বলাও পাপ। ব্রাহ্মণ হ'য়ে আপনারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, বিবেক-বিরুদ্ধ কথা কইচেন! আপনাদের জ্ঞানী এবং উদার হওয়াই উচিত। দেখুন—

চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কয়।

শুধু বেদ জান্‌লেই, শাস্ত্র জান্‌লেই ত শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না। তাতে বিদ্বান হওয়া যায় বটে; কিন্তু ভক্তি ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া, অন্তরের উদারতা ছাড়া, মানুষ কি কখনও বড় হ'তে পারে? প্রকৃত জ্ঞান লাভ হ'লে তখন যে ভেদাভেদ-জ্ঞান একেবারেই চ'লে যায়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া বৈষ্ণব খুব বিনয়ের সহিত—মিষ্ট কথায় নানা উদাহরণ দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এই মহাসত্য বুঝাইলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন বুঝিতে পারিলেন যে,—সত্যই ত যার অন্তর পবিত্র নয়, ভগবানের প্রতি যার প্রাণের টান নাই, সে তো মানুষই নয়—হোক্ না তার ব্রাহ্মণবংশে জন্ম; আর যদি নীচবংশে জন্মিয়াও কেউ পবিত্রচিত্ত হয়, তার অন্তর যদি ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, সে কেন উচ্চ হইবে না? সে তো ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠই বটে! ব্রাহ্মণদের মনেও তখন ভক্তির উদয় হইল।

—৪—

বৈষ্ণবকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণ চলিলেন সেই তাল-পুকুরের পাড়ে। গিয়া দেখিলেন পুকুরপাড়ের বৈষ্ণব তাঁর



বৈষ্ণব একমনে হরিনাম জপ করিতেছেন

কুটীরে বসিয়া একমনে হরিনাম জপ করিতেছেন। মুখখানা তাঁর আনন্দে যেন জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। কুটীরের পাশেই

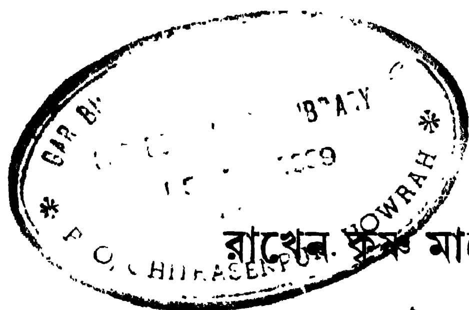
একটি তালগাছ, সেই গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—কে সাধুর সাম্‌নে যাইবে।

একজন অপরকে বলিলেন,—"সাধুর চরণামৃত নিয়ে এসো, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।"

কিন্তু কেহই আর তাঁর সাম্‌নে যাইতে চায় না। শেষে একজন বলিলেন,—"সাধু বৈষ্ণবের কাছে যেতে ভয়ের কোন কারণ থাক্‌তে পারে না, আমিই যাচ্ছি।" বলিয়াই তিনি গিয়া বৈষ্ণবের চরণামৃত লইয়া আসিলেন। বৈষ্ণব তখন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময়।

চরণামৃত আনিয়া যেমন অপরাধী ব্রাহ্মণ যুবক দুইটিকে দেওয়া হইল, তারা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের মত সুস্থ হইয়া উঠিল। গ্রামশুদ্ধ লোকের একেবারে তাক্‌ লাগিয়া গেল। তারপর সেই গ্রামের সকল লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। যেখানে এক দিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নিন্দা হইয়াছিল, সেইখানেই আজ সকলে সর্ব্বদা তাঁর গুণ-বর্ণন ও নাম-কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। বাড়ীতে বাড়ীতে মহোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, প্রকৃত বৈষ্ণব কাহারও নিগ্রহ করেন না, নিগ্রহের ছলে অনুগ্রহই করিয়া থাকেন, মঙ্গল সাধনই করেন।

যে বৈষ্ণবের কৃপায় এই ব্যাপার ঘটিল তিনিই চিরবিখ্যাত মহাপুরুষ **শ্রীহরিদাস ঠাকুর**।



রাখেন কৃষ্ণ মারে কে ?

—১—

এক রাজা। তাঁর ছিল এক জমাদার, নাম ভুবন চৌহান। ভুবনকে তিনি খুব বিশ্বাস করিতেন।

একদিন ভুবনকে সঙ্গে লইয়া তিনি মৃগয়ায় গেলেন। বনের মধ্য দিয়া পালে পালে হরিণ ও অন্যান্য জানোয়ার ছুটাছুটি করিতেছে। রাজা পশুশিকার করিতে লাগিলেন। ভুবনেরও শিকার করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। সে তার সাম্‌নে দেখিল এক হরিণী, অমনি তরোয়াল বাহির করিয়া মারিল খুব জোরে এক কোপ। হরিণীর পেটটা কাটিয়া গেল; তার পেটের ভিতরে ছিল একটা বাচ্ছা, সেই বাচ্ছাটাও দুই টুক্‌রা হইয়া গেল। রক্তে সেখানটা ভাসিয়া গেল। ভুবনের বড়ই দুঃখ হইল। একটা নিরীহ জীবকে এমনি করিয়া সে কাটিয়া ফেলিল! আর সেই বাচ্ছাটা! আহা! কেন সে এমন নিষ্ঠুর কাজ করিল! দুঃখে তার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তখনই সে প্রতিজ্ঞা করিল জীবনে আর কোনও দিন তরোয়াল ধরিবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলে কি হইবে? সে ত রাজার জমাদার, চাকরী ত তাকে করিতেই হইবে, নইলে তার স্ত্রী-পুত্র বাঁচিবে কি খাইয়া? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে স্থির

করিল যে, তার তরোয়ালের খাপের মধ্যে একটি কাঠের তরোয়াল রাখিয়া দিবে। কাউকে কিছু না বলিয়া সত্যই সে একটা কাঠের তরোয়াল তৈয়ারী করিয়া খাপের মধ্যে রাখিয়া দিল।

কিছুই চিরকাল গোপন থাকে না। একজন টের পাইয়া রাজাকে গিয়া বলিল। রাজা শুনিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন,—"আমার জমাদার হ'য়ে কাঠের তরোয়াল ব্যবহার করাও যা, আমাকে অপমান করাও তা। আমার কিন্তু এখনও সত্যি ব'লে মনে হচ্ছে না।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, এ একেবারে সত্যি কথা, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করুন।"

রাজা বলিলেন,—"আচ্ছা তাই কর্‌ব।"

—২—

রাজা এক কৌশল করিলেন। পাত্র-মিত্র, জমাদারগণ ও ভুবনকে লইয়া তিনি গেলেন তাঁর বাগান-বাড়ীতে। সকল জমাদারের কোমরেই তরোয়াল ঝুলিতেছে, রৌদ্রে একেবারে ঝক্‌-ঝক্‌ চক্‌-চক্‌ করিতেছে। এমন সময় রাজা হাসিতে হাসিতে তাদের বলিলেন,—"তোমাদের তরোয়াল-গুলো খুলে দেখাও তো একবার, কার তরোয়ালটা কেমন একবার দেখি।"

রাজার এই হুকুম শুনিয়াই ভুবনের মুখ ত একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। এখন উপায়? চাকরী ত যাইবেই, লজ্জারও সীমা থাকিবে না। এবিপদে ভগবান ছাড়া রক্ষা করিবার আর কেউ নাই, তাই সে মনে-প্রাণে ভগবানকেই ডাকিতে লাগিল।

একে একে সকলে খাপ থেকে তরোয়াল খুলিয়া দেখাইতে লাগিল। এবার ভুবনের পালা। যা করেন ভগবান, তিনি মারিলে কেউ রক্ষা করিতে পারে না, আর তিনি রক্ষা করিলে কেউ মারিতে পারে না। এই বিশ্বাসের বলেই সে খাপ থেকে তরোয়াল বাহির করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কোথায় গেল সেই কাঠের তরোয়াল! দেখা গেল তার হাতে ইস্পাতের খুব ভাল তরোয়াল ঝক্-ঝক্ করিতেছে।

রাজা ভাবিলেন,—'তাই ত! একে অবিশ্বাস ক'রে খুবই অন্যায় করেচি। যে এর বিরুদ্ধে আমায় এসে বলেচে, আমি একে ভালবাসি ব'লে তার বড্ড ঈর্ষ্যা হয়েচে। আচ্ছা, তাকে দেখাচ্ছি।'

তারপর রাজা তাকে বলিলেন,—"তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী, তোমার অসাধ্য কিছু নেই। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলুম। জল্লাদ—"

জল্লাদ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন,—"একে বধ্যস্থানে নিয়ে গিয়ে বধ কর।"

ভুবন দেখিল শুধু শুধু একটা লোকের প্রাণদণ্ড হইতেছে, অথচ এ লোকটা ত মিথ্যা বলে নাই। স্থির থাকিতে না পারিয়া করযোড়ে সে বলিল,—"মহারাজ, এ লোকটি মিথ্যে বলে নি, একে শাস্তি দেবেন না। আমার সত্যিই কাঠের তরোয়াল ছিল।"

রাজা বলিলেন,—"সে কি !"

ভুবন বলিল,—"মহারাজ, দয়া ক'রে আমার সব কথা শুনুন।"

ভুবন সমস্ত ঘটনা বলিল।

রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন,—"তুমি ভগবানের অনুগ্রহ পেয়েচ, ভুবন। তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে ? তোমাকে আর চাকরী করতে হবে না। বাড়ীতে গিয়ে জীবনের বাকী ক'টি দিন ভগবানের নাম ক'রেই কাটিয়ে দাও। আমি রাজকোষ থেকেই তোমার সংসারের সকল খরচের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

ভুবন চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।



চন্দ্রহাস

—১—

শত্রু আসিয়া এক রাজার রাজ্য আক্রমণ করিল, রাজ্যে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রাজা যুদ্ধে হারিয়া গেলেন। রাজপুরী রক্ষা করাও শেষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সেই সময়ে শিশু রাজপুত্রকে অন্য এক দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই শিশুর নাম চন্দ্রহাস।

চন্দ্রহাস অন্য দেশে এখানে সেখানে, এর কাছে তার কাছে মহা দুঃখের মধ্যেই মানুষ হইতে লাগিল। একদিন সেই দেশের রাজার দেওয়ান চন্দ্রহাসকে নিয়া রাজাকে ভেট দিলেন। তখনকার দিনে ভেটের সঙ্গে মানুষও দেওয়া হইত। রাজবাড়ীর ঝি-চাকরদের ছেলেপুলেদের সঙ্গে নানা লাঞ্ছনার মধ্যে চন্দ্রহাস দিন কাটাইতে লাগিল। রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই তাকে দাসীর ছেলে বলিয়া জানিত।

একদিন এক উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ীতে বহু ব্রাহ্মণ আসিলেন। তাঁরা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে তাঁদের দেখিবার একান্ত আগ্রহে ঝি-চাকরদের ছেলেমেয়েরাও ছুটিয়া আসিল, চন্দ্রহাসও তাদের সঙ্গে ছিল। তাকে দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি সুন্দর এই ছেলেটি!

এর এমন একটি সুলক্ষণ আছে যে, কোন রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয়ই এর বিয়ে হবে।”

আর এক ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“শুধু রাজকন্যার সঙ্গে বিয়েই নয়, এ রাজাও হবে নিশ্চয়।”

রাজা কাছেই ছিলেন,—শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন,—‘চন্দ্রহাস ত আমার বাড়ীতেই থাকে, তবে কি আমার মেয়ের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে নাকি! ছি ছি! একটা ঝিয়ের ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে কর্‌বে আর রাজা হবে! ব্রাহ্মণরা লক্ষণ দেখে যা বলেচে তা ত সহজে ব্যর্থ হবার নয়। এর প্রতীকার কি? ওকে একেবারে সাবাড় কর্‌লে হয় না? তাই করা যাক্।’

মনের কথা মনেই রাখিয়া তিনি জল্লাদদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—“চন্দ্রহাসকে মশানে নিয়ে গিয়ে বধ ক’রে একটা চিহ্ন নিয়ে আসা চাই। খবরদার কেউ যেন কিছু টের না পায়।”

জল্লাদরা ত নানা কথায় ভুলাইয়া চন্দ্রহাসকে মশানে লইয়া গেল। সরল বালককে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইল।

চন্দ্রহাস বলিল,—“আমি মর্‌তে প্রস্তুত আছি জল্লাদ। কিন্তু মর্‌বার পূর্ব্বে আমায় একটু সময় দাও, একবার জন্মের মত ভগবান্‌কে ডেকে নেই।”

জল্লাদদের মনও খুব নরম হইয়া পড়িল। আহা! এমন সুন্দর ছেলে,—একে কি করিয়া হত্যা করা যায়?

চন্দ্রহাস হাতজোড় করিয়া চক্ষু বুজিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিল।

প্রথম জল্লাদ দ্বিতীয় জল্লাদকে বলিল,—"ভাই, একে বধ ক'রে কাজ নেই, বড্ড মায়া হচ্ছে।"

দ্বিতীয় জল্লাদ বলিল,—"আমারও বড্ড মায়া হচ্ছে। এক কাজ করা যাক্, এর হাতে ছয়টা আঙ্গুল আছে। এসো আমরা একটা আঙ্গুল কেটে নিয়ে রাজাকে দেখাই; আর ওকে ছেড়ে দেই। ও এক দিকে পালিয়ে যাক্।"

চন্দ্রহাসকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে গিয়া এক গভীর বনে প্রবেশ করিল।

যে বনে চন্দ্রহাস ছিল এক রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া সেই বন ঘিরিয়া ফেলিলেন। বনের মধ্যে চন্দ্রহাসকে দেখিতে পাইয়া রাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; ভাবিলেন,—'এমন সুন্দর ছেলেটিকে ভেট দিলে খুব ভাল হয়।' যে রাজা চন্দ্রহাসকে বধ করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই রাজার কাছেই এই রাজা অনেক দাসদাসী সহ চন্দ্রহাসকে ভেট পাঠাইলেন।

রাজা ত চন্দ্রহাসকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। যাকে বধ করিয়া জল্লাদরা আঙ্গুল কাটিয়া আনিয়া দেখাইয়াছে এ যে সেই চন্দ্রহাস! তিনি বুঝিলেন জল্লাদরা তাঁকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। তিনি না পারেন কিছু বলিতে, না পারেন সইতে, এমন বিপদেই পড়িলেন। তবু চন্দ্রহাসকে বধ করিবার এক নূতন ফন্দী আঁটিলেন।

—২—

রাজবাড়ী থেকে অনেকদূরে এক সুন্দর বাগান-বাড়ীতে রাজপুত্র থাকেন। রাজকন্যাও ভাইয়ের সঙ্গেই সেখানে থাকেন। বোনকে ছাড়া ভাই থাকিতে পারেন না, আর ভাইকে ছাড়া বোনও থাকিতে পারেন না। রাজকন্যার নাম বিষয়া, কিন্তু আদর করিয়া সকলে তাঁকে “বিষে” বলিয়া ডাকে।

এদিকে রাজা রাজপুত্রকে একখানি চিঠি লিখিলেন। চিঠি-খানি খামে পুরিয়া আটকাইয়া চন্দ্রহাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—“তুমি এক্ষুণি যাও এই চিঠি নিয়ে রাজপুত্রের কাছে।”

রাজা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,—“পত্র পাওয়া মাত্র এই বালককে বিষ দিবে।” চন্দ্রহাস ত চলিয়া চলিয়া রাজপুত্রের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তার চেহারা দেখিয়া রাজ-পুত্রের বড়ই ভাল লাগিল। চিঠি পড়িয়া তিনি ভাবিলেন যে, রাজা এই বালকের সঙ্গে এখনই বিষয়াকে বিবাহ দিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁর সরল মন, ‘বিষ’ দেখিতে তিনি দেখিলেন ‘বিষে’ লেখা আছে। তিনি বুঝিলেন চন্দ্রহাসের সঙ্গে বিষয়ার বিবাহ হইলে বেশ ভালই হয়, তাই রাজা তখনই বিবাহের আদেশ দিয়াছেন।

রাজার আদেশ, বিলম্ব করিবার উপায় নাই। রাজপুত্র তখনই পুরোহিত ডাকাইয়া আনিলেন। বিবাহের আয়োজন হইল। বেলা গেল, সন্ধ্যা হইল। চন্দ্রহাসের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল।

এদিকে রাজা বসিয়া ভাবিতেছেন যে, এতক্ষণে চন্দ্রহাস নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে। যাওয়া মাত্রই ত তাকে বিষ দেওয়া হইয়াছে, কাজেই মরিতে আর কতক্ষণ লাগে ?

বিবাহের পর রাজপুত্র বর-কনে লইয়া রাজবাড়ীতে ফিরিলেন। রাজার ত চক্ষু স্থির। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে তিনি যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিলেন। এ কি হইল ! কি সর্ব্বনাশ ! শেষে ব্রাহ্মণের কথাই সত্য হইল !

রাজার চক্রান্ত রাজবাড়ীর কেউই জানিত না, কাজেই সকলে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বর-কনেকে ঘরে তুলিল।

মেয়ের বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু রাজার মন টলিল না। মেয়ে বিধবা হয় হোক, তবু চন্দ্রহাসকে বধ করাই চাই ! এবার তিনি আর এক ফন্দী করিলেন। পরদিন চন্দ্রহাসকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"দেখ বাবা, আমাদের প্রথা আছে সন্ধ্যার পর নতুন জামাইকে আমাদেরই দেবমন্দিরে গিয়ে মা কালীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌তে হয়। তোমাকেও আজ যেতে হবে।"

রাজী হইয়া চন্দ্রহাস বাহির হইয়া আসিল। আর রাজাও এদিকে জল্লাদকে ডাকিয়া আনিয়া বলিয়া দিলেন,—"খড়্গা নিয়ে মন্দিরের ভিতর লুকিয়ে থাক্‌বে, চন্দ্রহাস যেমনি কালীকে প্রণাম কর্‌বে অমনি খাঁড়া দিয়ে ঘা মার্‌বে। এক কোপেই সাবাড় করা চাই।"

জল্লাদ খড়্গা লইয়া গিয়া মন্দিরের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

এদিকে বেলা গেল। চন্দ্রহাস মন্দিরের দিকে চলিলেন। রাজপুত্রও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। চন্দ্রহাস বলিল,—“ভাই, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কি ক’রে কর্‌তে হয় আমি ত জানি নে।”

রাজপুত্র বলিলেন,—“আচ্ছা, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব।”

দু’জনেই মন্দিরে প্রবেশ করিল। সাম্‌নে রাজপুত্র, পিছনে চন্দ্রহাস। দেবীর সাম্‌নে একটি মাটির প্রদীপ টিম্‌-টিম্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। আর কোথাও কোন আলো নাই। অন্ধকারের মধ্য দিয়া গিয়া সেই অস্পষ্ট আলোকের সাম্‌নে কালীমূর্ত্তির দিকে চন্দ্রহাস চাহিয়া রহিল। রাজপুত্র উপুড় হইয়া যেমনি প্রণাম করিলেন, অমনি জল্লাদের ভীষণ খড়্গ আসিয়া পড়িল তাঁরই ঘাড়ে। চক্ষের নিমিষে তাঁর মুণ্ডটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। রক্তে মন্দিরের মেঝে লাল হইয়া উঠিল।

জল্লাদ রাজার কাছে ছুটিয়া গিয়া খুব উল্লাসের সহিত বলিল,—“মহারাজ, কাজ সাবাড় ক’রে এসেচি।”

রাজার মনে খুবই আনন্দ হইল। খুব উৎসাহের সহিত তিনি জল্লাদের সঙ্গে মন্দিরে চলিলেন, কিন্তু গিয়া যা দেখিলেন তাতে তাঁর জ্ঞান লোপ পাইল। “হায় হায়” করিয়া একবার তিনি বুকফাটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, তারপরেই ছেলের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। রাজবাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল।

ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

বোবা রাজপুত্র

—১—

এক রাজা। তাঁর রাজ্য ছিল যেমন বিশাল, ধন-দৌলতও ছিল তেমনই অসীম। কিন্তু সন্তান ছিল না বলিয়া তাঁর দুঃখেরও সীমা ছিল না। বহু আরাধনার পর ভগবানের দয়া হইল, রাজার একটি পুত্র হইল। রাজবাড়ীতে মহা-আনন্দের কোলাহল উঠিল। রাজপুত্রকে দেবদূত মনে করিয়া সকলেই তাঁকে অত্যন্ত আদর করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁকে না দেখিয়া একটু কালও থাকিতে পারেন না, আর রাণী তাঁকে এক মুহূর্ত্ত দেখিতে না পাইলে চোখে অন্ধকার দেখেন।

কিছু দিন যায়। রাজপুত্র অনেকটা বড় হইয়াছেন, কিন্তু একটি কথাও ক'ন না, কোন শব্দই তাঁর মুখ থেকে বাহির হয় না। রাজা বড়ই বিমর্ষ হইলেন। রাণীর দুঃখের আর সীমা নাই ; ছেলের মুখের 'মা' ডাক একবার শুনিতে পাইলেন না। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া এক একবার চোখের জল ফেলেন। ভাবেন—ভগবান দয়া করিয়া একটি ছেলে দিলেনই যদি, কোন্ অপরাধে তাকে বোবা করিয়া রাখিলেন !

একদিন মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ, রাজকুমার কোন কথাই বল্‌চেন না বটে, কিন্তু আমি খুব ভাল ক'রে দেখেছি বোবার কোন লক্ষণই তাঁর নেই।"

রাজা বলিলেন,—"লক্ষণ থাক্ আর নাই থাক্ একই কথা। ভগবানেরই ইচ্ছা রাজকুমার বোবা হ'য়ে থাক্‌বে, আমাদের আর কি কর্‌বার আছে বলুন।"

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মন্ত্রী এক মৎলব ঠাওরাইলেন; বলিলেন,—"মহারাজ, আমাদের সৈন্যেরা দুই-একদিনের মধ্যেই মৃগয়ায় যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে রাজপুত্রকে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়, সেখানে যদি কোন কারণে কথা ব'লে ফেলেন। একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখা যাক্ না।"

রাজা বলিলেন,—"তাই যদি ভাল মনে করেন, পাঠিয়ে দিন। আমার কোন আপত্তি নেই।"

—২—

বন—বনের পর বন। ছোট বড় কত রকমের জানোয়ার বনে বনে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কেমন সুন্দর তাদের দেখিতে। চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া রাজকুমারের মনে আনন্দ আর ধরে না। তিনি বনের মধ্যে একবার এদিকে, একবার সেদিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার জন্য রাজা এক জমাদারকে পাঠাইয়াছিলেন। রাজকুমারের আনন্দ দেখিয়া তারও খুব আনন্দ হইতেছিল।

এদিকে এক হরিণী দেখিয়া এক সেপাই অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিল। হরিণীর পেটটা কাটিয়া গেল, আর পেটের ভিতর থেকে একটা বাচ্ছা মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া রাজপুত্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ তিনি সেপাইকে বলিয়া উঠিলেন,—"হায় অবোধ! তুমি কি নিষ্ঠুর! কি দোষে তুমি এমনি ক'রে একে মার্‌লে?"

রাজপুত্র আর কথা কহিলেন না। তাঁর দুই চোখ থেকে দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তিনি কথা কহিয়াছেন দেখিয়া জমাদারের বড়ই আনন্দ হইল। আর বিলম্ব না করিয়া রাজপুত্রকে লইয়া সে রাজবাড়ীতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি রাজার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল,—"মহারাজ, রাজপুত্র কথা কয়েচেন।"

বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন,—"বল কি!"

জমাদার বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। একটা হরিণীর মৃত্যু দেখে স্থির থাক্‌তে না পেরে রাজপুত্র কথা ক'য়ে ফেলেচেন।"

রাজা বলিলেন,—"বটে! ওরে কে আছিস্‌, রাজপুত্রকে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

হুকুম শুনিয়াই একজন রাজকর্ম্মচারী গিয়া রাজপুত্রকে লইয়া আসিল।

তাঁকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি কথা কয়েচ—একথায় বড়ই আনন্দ হয়েচে। আমায় একটা কথা শোনাও বাবা, আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক্।"

রাজপুত্র চুপ করিয়াই রহিলেন। রাজা আবার বলিলেন। রাজপুত্র তবু চুপ। কত আদর, কত কাকুতি-মিনতি—তবু তিনি কথা কহিলেন না।

রাজা এবার চটিয়া গেলেন—জমাদারের উপরে। ভাবিলেন জমাদার মিথ্যাকথা বলিয়াছে এবং মজা দেখিবার জন্য তাঁকে অনর্থক দুঃখ দিয়া উপহাস করিয়াছে। জমাদারকে বলিলেন,—"মিথ্যাবাদী কোথাকার! তোমার এত আস্পর্দ্ধা যে তুমি আমার সঙ্গে চালাকী মার্‌তে এসেচ!"

সে যে সত্যই বলিয়াছে—ইহা বুঝাইবার জন্য জমাদার অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু রাজা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন।

হুকুম শুনিয়াই জল্লাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাণরক্ষার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া জমাদার রাজপুত্রকে বলিল,—"কুমার, তুমি দয়া ক'রে কথা না কইলে যে আমার প্রাণ যায়। শুধু শুধু একজনের প্রাণদণ্ড হবে, আর তুমি চুপ ক'রে থাক্‌বে? হরিণীকে যখন বধ করা হ'ল তখন ত চুপ ক'রে থাক্‌তে পার নি। চুপ ক'রে থাক্‌বে মানুষের বেলায়?"

রাজপুত্র আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শুধু এইটুকু বলিলেন,—"আমি ত কথা কয়েচি।"

রাজা শুনিলেন। জমাদারকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন, তাকে মুক্তির আদেশ দিলেন। রাজপুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া খুব আদর করিয়া বলিলেন,—"বাবা, যদি কথা কইলেই তবে আর কেন চুপ ক'রে থাক?"

কত অনুনয়-বিনয়, তবু রাজপুত্র কথা কহিলেন না। রাজা তখন দেশের নাম-করা পণ্ডিতদের ডাকিয়া আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, রাজপুত্র জাতিস্মর, পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথাই তাঁর মনে আছে। কথা কওয়ার জন্যে তপস্যায় বড়ই দাগা পেয়েছিলেন, এজন্মে তাই তিনি নৈষ্ঠিক মৌনী হ'য়ে আছেন। তিনি আর কথা কইবেন না।"

সাক্ষীগোপাল

—১—

দুই ব্রাহ্মণ। একজন ছোট আর একজন বড়। ছোটটি বড়টির শিষ্য। শিষ্য গুরুর কাছে শাস্ত্রের কথা, ধর্ম্মের কথা শোনেন, আর গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করেন।

একদিন গুরু শিষ্যকে বলিলেন,—"সংসার ত আর ভাল লাগে না, একবার তীর্থভ্রমণ ক'রে আসি চল।"

—"যে আজ্ঞে। কোন্ তীর্থে যেতে ইচ্ছা হয়?"

—"আমার ত ইচ্ছে একবার শ্রীবৃন্দাবন যাব।"

—"আজ্ঞে, তাই চলুন।"

দুই-একদিনের মধ্যেই পোটলা-পুটুলি বাঁধিয়া গুরু-শিষ্য বাহির হইয়া পড়িলেন; দিনের পর দিন চলিতেছেন। গুরুর বয়স বেশী, কাজেই তিনি একটু বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। পথে তাঁর বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শিষ্য প্রাণপণে তাঁর সেবা করিতে লাগিলেন। শেষে অতি কষ্টে তাঁরা বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। এতদিন পথ-চলার সমস্ত কষ্ট যেন এক মুহূর্ত্তেই দূর হইয়া গেল, আনন্দে প্রাণ ভরিয়া গেল। শ্রীগোপালের মন্দিরে গিয়া তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

খানিক পরে শিষ্যকে গুরু বলিলেন,—“দেখ, আমি একটা কথা ভাব্‌চি। তোমার সেবায় ও যত্নে এতই খুশী হয়েচি যে, আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই।”

শিষ্য বলিলেন,—“তা কি হয় গুরুদেব? আপনি কুলে মানে আমার চেয়ে ঢের ওপরে।”

—“কুল-মান ব’লে কিছুই নেই। তোমাকেই যোগ্য মনে করেচি, তোমাকেই কন্যা দেব। এই ত ঠাকুর রয়েচেন, ঠাকুরের সাম্‌নেই এই কথা বল্‌লুম।”

কিছুদিন যায়। তীর্থভ্রমণ করিয়া গুরু-শিষ্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

গুরু তাঁর পরিবারের সকলকে মেয়ের বিয়ের কথা বলিলেন। সকলেই বড় অসন্তুষ্ট হইল। গুরুর পুত্র ত মহা রাগিয়া বলিয়া উঠিল,—“যদি এমন অপাত্রেই আমার ভগ্নীকে বিয়ে দেওয়া হয়, তবে আত্মহত্যা করব।”

মহা বিপদ! ঠাকুরের সাম্‌নে তিনি যে কথা দিয়াছেন, রক্ষা করিতে না পারিলে যে ঘোর অধর্ম্ম হয়! কি করা যায়? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি গাঁয়ের সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের ডাকিয়া আনিলেন। তাঁরাও গুরুপুত্রকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রটি ত বুঝিলই না, উল্টা বলিয়া বসিল,—“বাবার এই শিষ্যটি বাবাকে সিদ্ধি খাইয়ে সব টাকা চুরি ক’রে নিয়েচে, আর সেই অজ্ঞান অবস্থায়ই বিয়ের কথাটিও বের ক’রে নিয়েচে।”

শিষ্য বলিলেন,—"চুরির কথা একদম মিথ্যে, আর বিয়ের কথারও সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং শ্রীগোপাল। মানুষ কেউ সেখানে ছিল না—একথা ঠিক, কিন্তু ঠাকুর ত ছিলেন সেখানে।"

গুরুপুত্র বলিল,—"বেশ কথা, যদি স্বয়ং গোপাল বলেন যে, বাবা বিয়ের কথা দিয়েছিলেন, তবে আমি রাজী হব।"

গুরুপুত্র মনে করিয়াছিল যে, গোপালকে দিয়া সাক্ষ্য দেওয়ানো ত আর সম্ভব নয়, সুতরাং শিষ্য এবার জব্দ হইবেন।

শিষ্যের মনে কিন্তু একটা জীবন্ত বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুরের সাম্‌নে যখন কথা হইয়াছে তখন একথা ঠাকুরই সকলকে শুনাইয়া দিবেন। এদিকে গুরুও একমনে একপ্রাণে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন, এ বিপদে তিনি যদি রক্ষা না করেন তবে যে কথা রক্ষা হয় না—ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

—২—

শিষ্য চলিয়াছেন, মনে মনে শুধু গোপালকেই চিন্তা করিতেছেন। কয়েকদিন পরেই বৃন্দাবনের যোগপীঠে গিয়া গোপালের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন—ঠাকুরের সাম্‌নে বসিয়া কতই না কাঁদিলেন।

গভীর রাত্রি। শিষ্য চোখের জলে ভাসিতেছেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, গোপাল বলিতেছেন,—

"আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষী হ'য়ে যেতে রাজী আছি, কিন্তু একটি কথা মনে রেখো। পথে যেতে যেতে যদি কখনও পেছন দিকে তাকাও তবে আমি আর এক পাও নড়্‌ব না, ঠিক সেখানেই থেকে যাব।"

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, তুমি যে আমার পেছন পেছন আস্‌চ তা আমি বুঝ্‌ব কি ক'রে?"

ঠাকুর বলিলেন,—"তুমি নূপুরের শব্দ শুন্‌তে পাবে।"

শিষ্য এইবার দেশের দিকে চলিলেন। ঠাকুর যে চলিয়া আসিতেছেন তাঁর পেছনে নূপুরের শব্দেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি যখন নিজের গ্রামের কাছাকাছি আসিয়াছেন, তখন নূপুরের ছিদ্রের মধ্যে বালি ঢুকিয়া শব্দ বন্ধ হইল। শব্দ শুনিতে না পাইয়া তাঁর সন্দেহ হইল, তিনি পেছনে তাকাইলেন।

ব্যস্‌, ঠাকুরও সেখানেই থামিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া শিষ্য নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং গুরু ও গুরুপুত্রকে কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাপারটি বলিলেন।

কথাটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গ্রাম থেকে বহু লোক সেখানে ছুটিয়া আসিল। মাঠের মাঝখানে গোপালের বিগ্রহ দেখিয়া গ্রামবাসী সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

ঠিক তখনই এক দৈববাণী হইল,—"বিবাহের কথা সত্যি, আমিই সাক্ষী।"

সকলেই তখন শিষ্যের কথা বিশ্বাস করিল। গুরু তাঁরই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন।

*   *   *   *

গোপালের মূর্ত্তি যেখানে রহিল সেইখানে উড়িষ্যার রাজা এক মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া গোপালের নাম হইল **সাক্ষীগোপাল**।

এখনও পুরীর কাছে সাক্ষীগোপালের মন্দির আছে। কলিকাতা থেকে বি. এন. রেলে গেলে পুরীর আগে যে ষ্টেশনটিতে পৌঁছিতে পারা যায়, সেই ষ্টেশনটিরও নাম হইয়াছে সাক্ষীগোপাল। এই ষ্টেশন থেকেই সাক্ষীগোপালের মন্দিরে খুব সহজে পৌঁছানো যায়।

ডাকাত ব্রাহ্মণ

এক ব্রাহ্মণ, নাম নিষ্কিঞ্চন। যত অসহায়, অন্ধ, আতুর তার কাছে আসে, যত অতিথি আসে, সে সকলেরই সেবা করে। বিষয়-আশয় যা-কিছু ছিল, তার সবই গেছে। শেষে এমন অবস্থাই তার হইল যে, আর কাউকে সাহায্য করিবার মত তার আর কিছু রহিল না। সে ত মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেল। দুই-তিন দিন ধরিয়া নানা জায়গায় অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু জোগাড় করিতে পারিল না। শেষে স্থির করিল যে, পথিকদের সর্ব্বস্ব লুট করিয়াও সে দুঃস্থের সেবা করিবেই করিবে।

তার গ্রাম থেকে খানিকদূরে পথের পাশে ঝোঁপের আড়ালে নিষ্কিঞ্চন লুকাইয়া থাকে। কত পথিক নিশ্চিন্তমনে চলিয়া যায়। যার কাছে কিছু আছে বলিয়া সে মনে করে, একটু সুযোগ পাইলেই তাকে ধরে আর সব কাড়িয়া লয়। সে এখন দস্যু।

ইহা দেখিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। রুক্মিণী ঠাকুরাণীও তাঁর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। দুই জনেই সাধারণ গৃহস্থের বেশে সেই পথ দিয়া চলিলেন।

দূর থেকে তাঁদের দেখিয়াই নিষ্কিঞ্চনও ঝোঁপের আড়ালে বসিল। কাছে আসিতেই ঠাকুর ত হঠাৎ পেছন থেকে

বনের মধ্যে গিয়া লুকাইলেন, আর সুযোগ বুঝিয়া দস্যুও ঝোঁপের আড়াল থেকে বাহির হইয়া আসিয়া ঠাকুরাণীর



হাতখানি খপ করিয়া ধরিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁর বহুমূল্য অলঙ্কার খুলিয়া লইল। ঠাকুরাণী পেছনদিকে ফিরিয়া

দেখিলেন ঠাকুর নাই, তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকার শুনিয়া ঠাকুর ত· বন থেকে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরাণী তখন রাগ করিয়া বলিলেন,—"দস্যুর হাতে ফেলে এমনি ক'রে কি পালিয়ে যেতে হয়? ছি! ছি!"

ঠাকুর বলিলেন,—"দস্যু বল্চ কাকে? এ ত দস্যু নয়, এ যে আমার পরম ভক্ত।"

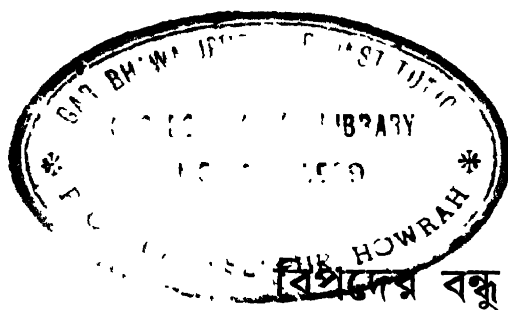
ঠাকুরাণী বলিলেন,—"বেশ ত তোমার ভক্ত! অসহায় স্ত্রীলোকের গয়না পর্য্যন্ত জোর ক'রে কেড়ে নেয়!"

ঠাকুর বলিলেন,—"পরের উপকার করার জন্য, দুঃস্থের সেবার জন্য চুরি করে, নিজের জন্য চুরি করে না। এই সেবাই আমার সেবা।"

এই কথা শুনিয়া নিষ্কিঞ্চনের মনের ভাব বদলাইয়া গেল। কাঁদিয়া আকুল হইয়া সে বলিল,—"তোমার এত দয়া ঠাকুর! আমার মত পাতকীর কাছেই এসে থাক যদি, তোমার সেই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি আমায় একবার দেখাও, আমি ধন্য হই।"

ঠাকুর তখন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিষ্কিঞ্চন প্রাণ ভরিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল; কোথায়ই বা ঠাকুর আর কোথায়ই বা ঠাকুরাণী!

নিষ্কিঞ্চন আর বাড়ী ফিরিল না।



বিপ্রদের বন্ধু

—১—

দক্ষিণ ভারতের এক বিশাল দেবমন্দিরে বহুদূর থেকেও হাজার হাজার নরনারী আসে ঠাকুর দর্শন করিতে। সকলেরই বিশ্বাস যে, মন্দিরের পূজারী একজন ভক্ত। সন্ধ্যার সময় কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, আরতি হয়, আর সারি সারি লোক করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন এক রাজপুত রাজার ইচ্ছা হইল ঠাকুর দর্শন করিতে। রাজার প্রবল প্রতাপ। চারিদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়াছে, আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। পাত্র-মিত্রসহ রাজা মন্দিরে আসিলেন, সকলেই তটস্থ হইয়া রাজার দিকে তাকাইল। পূজারী একমনে আরতিই করিতে লাগিলেন। আরতির পর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া রাজা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে ঠাকুরের গলা থেকে একটি ফুলের মালা আনিয়া পূজারী রাজার গলায় পরাইয়া দিলেন। কিন্তু মালার দিকে তাকাইতেই রাজা দেখিলেন যে, তাতে একটা চুল লাগিয়া আছে, কাজেই অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া পূজারীকে বলিলেন,—“এই চুল-

লাগানো অপবিত্র মালা ঠাকুরের গলায় কি ক'রে পরিয়েছিলে হে? পূজা কর্‌তে এসে কেবল চা'ল, কলা আর পয়সার দিকে নজর, নয়? তোমার মত পূজারী দ্বারা মন্দির অপবিত্র হয়।"

পূজারীর বড় ভয় হইল। তিনি বুঝিতেই পারিলেন না—মালায় চুল আসিল কি করিয়া। থতমত খাইয়া বলিলেন,—"মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, ঠাকুরের মাথার চুল লেগে গেচে।"

রাজা মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন,—"ঠাকুরের মাথার চুল! ইয়ার্‌কি মার্‌বার বুঝি আর জায়গা পাও নি! দেখাও দেখি ঠাকুরের মাথায় চুল।"

পূজারী বলিলেন,—"মহারাজ, ঠাকুরের মাথায় ফুল রয়েচে, আজ রাত্তিরে আর তা ফেল্‌ব না।"

রাজা বলিলেন,—"বেশ, কাল দিনে আমায় দেখাতে হবে। যদি দেখাতে না পার তবে তোমাকে এখান থেকে দূর ক'রে দেব, বুঝ্‌লে?"

রাজা মন্দির থেকে চলিয়া আসিলেন।

—২—

সমস্ত রাত্রি পূজারী মনে প্রাণে ঠাকুরকে ডাকিলেন। তাড়াইয়া দিলে আর যে ঠাকুরের সেবা করিতে পারিবেন না, এই দুঃখই তাঁর বুক যেন ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

ভোর হইল। রাজা সেপাই পাঠাইয়া দিলেন পূজারীকে ধরিয়া আনিবার জন্য। এদিকে পূজারী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ঠাকুরের মাথায় চুল গজাইয়াছে। ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান কত রকম খেলাই খেলেন! আমরা যা অসম্ভব মনে করি, তাও তিনি চক্ষের নিমেষে সম্ভব করিয়া তোলেন।

পূজারী সেপাইদের বলিলেন,—"রাজাকে আমি উপহাস করি নি। তোমরা বিশ্বেস না কর দেখে যাও ঠাকুরের মাথা-ভরা চুল।"

এক রাত্রির মধ্যেই ঠাকুরের মাথায় চুল গজাইয়াছে দেখিয়া সেপাইরা ত অবাক্! তাড়াতাড়ি গিয়া তারা রাজাকে খবর দিল।

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা মূর্খ, যে যা বলে তা-ই তোমরা বিশ্বেস কর। চল দেখি আমার সঙ্গে, পুরুত ঠাকুরের চালাকি ভেঙ্গে দিচ্ছি।"

রাজা মন্দিরে আসিলেন। পূজারী নমস্কার করিয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজা বলিলেন,—"দেখি তোমার বুজরুকিটা একবার।"

পূজারী বলিলেন,—"না মহারাজ, বুজরুকি নয়, সকলই তাঁর ইচ্ছা।"

রাজা ঠাকুরের মাথায় চুল দেখিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে বড়ই সন্দেহ হইল, তাই তিনি ঠাকুরের কাছে গিয়া একটি

চুল ধরিয়া টান মারিলেন। যেই টান মারা অমনি ঠাকুরের মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

কি সর্ব্বনাশ! রাজার ত চক্ষু স্থির। ভয়ে তাঁর বুক কাঁপিয়া উঠিল। পূজারীর পায়ে পড়িয়া তখন তিনি ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন।

পূজারী তাঁকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু সেই থেকে এই রাজার বংশধরগণের যিনিই এই ঠাকুর দর্শন করিতে গিয়াছেন, তিনিই আর বেশী দিন বাঁচিতে পারেন নাই।

আজ পর্য্যন্তও সেই রাজার বংশধর কেউ আর সে মন্দিরে যান না।

দেবতার দরদ

—১—

রাজকন্যার বিবাহ। রাজ্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা বলিলেন,—"মেয়ের বিয়েতে আমি খুব সুন্দর দুটি সোনার কলসী দিতে চাই। খুব ভাল স্যাক্‌রা কে আছে হে?"

পাত্র-মিত্র বলিলেন,—"মহারাজ, ত্রিলোক খুব ভাল স্যাক্‌রা। সোনার কলসী সে ছাড়া আর কেউ তৈরী কর্‌তে পার্‌বে না। আদেশ দিলে তাকেই খবর দেই।"

রাজার মত হইল। ত্রিলোকও রাজবাড়ী আসিল। দুইটি কলসীতে যত সোনার দরকার ততখানি সোনা তাকে ওজন করিয়া দেওয়া হইল। বিবাহের অন্ততঃ ঠিক তিন দিন পূর্ব্বে রাজবাড়ীতে সোনার কলসী দিয়া যাইতে হইবে ঠিক হইল।

এদিকে হইল কি—ত্রিলোক সেই সোনা বিক্রয় করিয়া বহু গরীব-দুঃখী, সাধু-বৈষ্ণবকে খুব ধুমধাম করিয়া খাওয়াইতে লাগিল; রাজকন্যার বিবাহের কথা ভুলিয়াই গেল।

বিবাহের ঠিক তিন দিন পূর্ব্বে রাজবাড়ী থেকে লোক গিয়া কলসী চাহিল। ত্রিলোকের মাথায় যেন আকাশ

ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করে? বলিল,—"কলসী তৈরী এখনও শেষ হয় নি। হ'লেই গিয়ে দিয়ে আস্‌ব'খন, চিন্তা কি?"

রাজার লোক ত তখনকার মত ফিরিয়া গেল। ত্রিলোকের বড়ই ভয় হইল। কিন্তু উপায় ত নাই। শেষে নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া সে এক গভীর বনে পলাইয়া গেল।

বিবাহের আগের দিন রাজা আবার লোক পাঠাইলেন। লোক গিয়া ত্রিলোককে পাইল না।

রাজা ভয়ানক চটিয়া গেলেন, লোকজন পাঠাইয়া হুকুম দিলেন,—"যেখানে পাও ত্রিলোককে ধ'রে নিয়ে এস।"

লোকজন গিয়া ত্রিলোকের বাড়ী ঘিরিয়া রাখিল, চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

—২—

এদিকে ঠিক ত্রিলোকের চেহারার একটি লোক দুইটি সুন্দর সোনার কলসী লইয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইল। রাজা ত চক্ষু লাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত দেরী হ'ল কেন? বিয়ের তিন দিন আগে দিতে হবে জান্‌তে না?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ, জানা ছিল, কিন্তু তখনও এতটা সুন্দর ক'রে তুল্‌তে পারি নি।"

রাজা বলিলেন,—"তা হ'লে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?"

—"না মহারাজ, পালাই নি। বিশেষ ভাল ক'রে তৈরী কর্‌বার জন্যেই বাড়ী থেকে চ'লে গিয়েছিলুম। পালিয়েচি মনে ক'রে আপনার লোকজন আমার বাড়ীতে খুব অত্যাচার কচ্ছে। অপরাধ হ'য়ে থাকে ক্ষমা করুন মহারাজ। একবার দয়া ক'রে দেখুন।"

রাজা কলসী দুইটি দেখিলেন। এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তিনি খুশী না হইয়া পারিলেন না। ত্রিলোকের বাড়ী থেকে চলিয়া আসিবার জন্য তিনি লোকজনদের হুকুম দিলেন, আর তাকে প্রচুর বক্‌শিস্‌ দিলেন।

সেই লোকটি রাজবাড়ী থেকে বাহির হইল। পথে অন্য এক লোকের চেহারা ধরিয়া ত্রিলোকের বাড়ী ঢুকিয়া বক্‌শিস্‌ রাখিয়া আসিল। তারপর কিছু খাবার লইয়া গভীর বনে ত্রিলোকের কাছে গেল। তাকে দেখিয়াই ত ত্রিলোকের ভয়ানক ভয় হইল; ভাবিল, বোধ হয় রাজবাড়ী থেকে কেউ তাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। তার অন্তরের এই কথা বুঝিতে পারিয়াই সেই লোকটি তাকে বলিল,—"ভয় নেই ভাই, ভয় নেই। আমি তোমায় ধ'রে নিয়ে যেতে আসি নি। তুমি না খেয়ে এখানে এসে ব'সে আছ, তাই তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেচি।"

তারপর রাজাকে কলসী দেওয়া, বক্‌শিস্‌ পাওয়া, তার বাড়ীতে তা রাখিয়া আসার কথা একে একে সে সব বলিল।

সব কথা শুনিতে শুনিতে ত্রিলোকের ভয় আর রহিল না।

চমকিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এত দয়া! তুমি কে? এ কি বিরাট রহস্য? তুমিই কি আমার দেবতা?"



"...তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেচি"

দেবতা তখন অদৃশ্য হইলেন। ত্রিলোক এতক্ষণে সব স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

———

মায়ার ফাঁস

—১—

এক সাধুপুরুষ, নাম মীননাথ। তাঁর চেহারাটি কার্ত্তিকের মত সুন্দর, আর বয়সও খুব কম। তাঁর ছিল এক শিষ্য, নাম গোরখনাথ। শিষ্যও গুরুরই মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সাধন-ভজন করেন।

একবার গুরু আর শিষ্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। চলিতে চলিতে অনেক দূরে এক রাজবাড়ীতে গিয়া তাঁরা অতিথি হইলেন। সাধুপুরুষ দেখিয়া রাজা মহাসমাদর করিলেন। তাঁরাও রাজার ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন।

সেদিন কাটিয়া গেল, পরদিনও গেল। রাজা আর ছাড়েন না, তাঁরাও আর যান না। একে একে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। গোরখনাথ বলেন,—"গুরুদেব, আর ত থাকা উচিত নয়, রাজবাড়ীর আদরে আর রাজভোগে ভুলে থাক্‌লে ত চল্‌বে না।"

মীননাথ কিন্তু আর যাইতে চান না। গোরখনাথও বেশী কিছু বলিতে পারেন না। গুরুকে কি বেশী কিছু বলা যায়?

মীননাথ বলেন,—"বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ো না, গোরখনাথ। দেখ্‌চ না, রাজা বিষয়ে একেবারে মত্ত হ'য়ে আছেন। কয়েক দিন থেকে দেখা যাক্‌ তাঁকে ঠিক পথে আন্‌তে পারা

যায় কিনা। তাঁকে ভক্তির পথে আন্‌বার চেষ্টা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?”

গোরখনাথ আর কি বলিবেন? বুঝিলেন গুরুদেবের কিছুদিন সেখানে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু গোরখনাথের আর সেখানে মন টিকিল না। যদি সবই ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন, যদি সমস্ত মায়ার বন্ধনই ছিন্ন করিলেন, তবে আর কেন এই আদর-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ায় ভুলিয়া থাকা? রাজার চিন্তা রাজাই করুন না! তাঁকে ভক্তি শিক্ষা দিতে আসিয়া যদি ক্রমে ক্রমে আবার এই সংসারের প্রতি, বিষয়-আশয়ের প্রতিই মন যায়! এই ভাবিয়া গোরখনাথ একদিন সেখান থেকে চুপি চুপি সরিয়া পড়িলেন।

—২—

রাজা মীননাথকে বড়ই ভালবাসেন। তাঁর চেহারা, তাঁর উজ্জ্বল মুখখানি, তাঁর স্বভাব-চরিত্র রাজাকে মুগ্ধ করিল। তিনি এখন সব জায়গায়—সব কাজেই মীননাথকে সঙ্গে লইয়া যান, এমন কি তাস-পাশা খেলিবার সময়ও তাঁকে লইয়াই খেলা করেন। এমনি করিয়াই সংসর্গের ফলে মীননাথ আবার মায়ায় আবদ্ধ হইলেন। তাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জীবনের লক্ষ্য, সবই তিনি ভুলিয়া গেলেন। অন্যের বন্ধন কাটিতে আসিয়া তিনি নিজেই আবদ্ধ হইলেন।

রাজার পুত্র ছিল না। তাঁর বড়ই ইচ্ছা হইল যে, তাঁর একমাত্র কন্যাকে এই মীননাথের সঙ্গে বিবাহ দেন। মীননাথও বিবাহে প্রথমে 'না না' করিয়া—শেষে রাজী হইলেন। রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া মীননাথ রাজার জামাই হইয়া বসিলেন।

কিছুদিন যায়। রাজার মৃত্যু হইল। মীননাথই সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁর এক পুত্র সন্তান হইল। তিনি এখন হইলেন ঘোর সংসারী।



এদিকে গোরখনাথ নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, কিন্তু গুরুর কথা ভুলিতে পারেন না। কি করিয়া গুরুকে মায়া থেকে মুক্ত করিয়া আনা যায়, এই চিন্তাই করেন। শেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একদিন তিনি সেই রাজবাড়ীতেই আসিলেন।

সিংহদ্বারে গালপাট্টাওলা বিরাট চেহারার দরোয়ান গোরখনাথকে বাড়ীতে ঢুকিতেই দিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়াই তিনি এক গান ধরিলেন। সেই গানের সুর মীননাথের কানে গেল। তাঁর মনটা কি রকম করিয়া উঠিল। সুর শুনিয়া গোরখনাথের কথা তাঁর মনে হইল। তাঁকে ডাকাইয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে নিলেন।

বাড়ীর মধ্যে যাইতেই মহাসমাদরে মীননাথ তাঁকে অভ্যর্থনা করিলেন।

গেল সেদিন। পরদিন গোরখনাথ বলিলেন,—“গুরুদেব, আপনি আমায় যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ঠিক মনে আছে কিনা জানি না, আমি ব’লে যাই, শুনুন ত।”

গুরুকে তিনি উপদেশ দিতে পারেন না, কাজেই এই কৌশল করিয়া নানা ভাবে ধর্ম্মের কথাই বলিতে লাগিলেন। এইসব শুনিয়া মীননাথের জ্ঞানচক্ষু আবার ফুটিল। পথের মাঝখানে তাঁর পদস্খলন হইয়াছিল, এজন্য তাঁর আর আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

একদিন কাকেও কিছু না বলিয়া তুজনেই আবার চুপি চুপি বাহির হইয়া গেলেন। স্ত্রী, পুত্র ও রাজত্বের মায়া আর মীননাথকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু সব ত্যাগ করিলেও, পথের কষ্টের কথা ভুলিতে না পারিয়া তিনি সঙ্গে একটি পুটুলিতে করিয়া কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়াছিলেন। গোরখনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, হায়রে মানুষের লোভ! রাজত্ব যিনি ত্যাগ করিলেন, স্ত্রী-পুত্র যিনি অনায়াসে ছাড়িয়া আসিলেন, তিনি এই মুক্তার লোভ দমন করিতে পারিলেন না! তিনি গুরুকে বলিলেন, —“গুরুদেব, পুটুলিটা আমার কাছে দিন। আমি থাকৃতে আপনি কেন বোঝা বইবেন? দিন আমার কাছে।”

মীননাথ দিলেন। গোরখনাথ বোঝা ঘাড়ে করিয়া

পিছনে পিছনে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক নদীর পাশে গিয়া তিনি মুক্তার পুঁটুলি নদীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন! মীননাথ 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন।

গোরখনাথ বলিলেন,—"গুরুদেব, আপনিই ত শিখিয়েচেন যে, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে ভগবানে পূর্ণ নির্ভর না কর্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না। যে মোহের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এসেচেন, আবার পেছন ফিরে সেদিকে তাকান কেন?"

মীননাথ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন,—"ঠিকই বলেচ গোরখনাথ। এতক্ষণে সত্যই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে গেল। চল আমরা এগিয়ে যাই।"



মনের সাধ

—১—

রায় সেন নামে এক রাজা। তাঁর সেনাপতির নাম অঙ্গদ। ইনি সম্পর্কে রাজার খুড়ো হইতেন। সেনাপতি সব কাজেই রাজার একেবারে ডান হাত ছিলেন। রাজ্যে তাঁর প্রবল প্রতাপ, যুদ্ধে তাঁর অসীম বীরত্ব। এক একটা যুদ্ধ হয়, বহু লোক ক্ষয় হয়, রক্তের স্রোত বয়, আর সেনাপতি যুদ্ধ থেকে ফিরিয়া আসিয়া তার বিবরণ সব জায়গায় বলেন। সকল লোকেই তাঁকে খুব মান্য-গণ্য করে।

সেনাপতির স্ত্রী অত্যন্ত দয়াশীলা। এই সব কাহিনী শুনিয়া তিনি চোখের জলে ভাসেন। মনে করেন তাঁর স্বামী অত্যন্ত নিষ্ঠুর; যদি তিনি এই নরহত্যা ত্যাগ করিয়া মানুষকে ভালবাসিতে পারিতেন! তিনি সেনাপতিকে কত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁর লাভ হইত শুধু অত্যাচার। একদিন পায়ে ধরিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিবার পর সেনাপতির মন ফিরিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর হিংসা করিবেন না, যুদ্ধে যাইবেন না, বাকী জীবন ভগবানের নাম করিয়াই কাটাইবেন। এতদিন পর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের আহত ও মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ স্মরণ করিয়া তিনি নিজেই শিহরিয়া উঠিলেন। রাজকার্য্যে আর ইচ্ছা নাই,

কিন্তু চাকরীর মায়াও হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারেন না। কোনও রকমে চাকরীটি বজায় রাখিলেন।

এদিকে রাজার ইচ্ছা হইল প্রতিবাসী এক রাজার রাজ্য আক্রমণ করিতে। সেনাপতি অঙ্গদ তাঁকে বুঝাইলেন,—"বেশ ত আছেন মহারাজ, শুধু শুধু যুদ্ধ কর্‌বেন কেন? রাজ্য কি কেবল বাড়াতেই হবে? যুদ্ধ কর্‌লেই নিরর্থক লোকক্ষয় ও অর্থক্ষয় হবেই, তাতে রাজ্যের অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ হবে না।"

রাজা কোন পরামর্শই শুনিলেন না, যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। রাজ্যের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। দুই-এক দিনের মধ্যেই রাজা সেনাপতিকে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে হুকুম দিলেন। অনেক আপত্তি করিয়াও যখন রেহাই পাইলেন না, তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই সেনাপতিকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল।

যুদ্ধে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করিলেন না। কাজেই প্রতিবাসী রাজার জয় হইল। জয় হওয়ায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেনাপতি অঙ্গদকে একটি বহুমূল্য পাগড়ী উপহার দিলেন। পাগড়ীতে একটা খুব বেশী দামী হীরক ছিল। অঙ্গদ ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং সেনাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। উপহার পাওয়া পাগড়ীটি তিনি রাজাকেই দিয়া আসিলেন।

—২—

রাজা যে অঙ্গদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন তা না বলিলেও চলে। তা ছাড়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, পাগড়ীতে যে বহুমূল্য হীরকটি ছিল, তা অঙ্গদ তাঁকে দেন নাই। অঙ্গদ মনে করিয়াছিলেন যে, এমন মূল্যবান জিনিস যদি জগন্নাথদেবের গলায় পরাইয়া দেওয়া যায়, তবে মনের সাধ মেটে। এই ভাবিয়া তিনি হীরকটি নিজের কাছেই রাখিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা বড়ই রাগিয়া গেলেন; হীরকটি আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তারা গিয়া অঙ্গদকে বাড়ীতে পাইল না। এবার রাজার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অঙ্গদের বাড়ী ঘিরিয়া রাখিবার জন্য সৈন্য-সামন্তদের হুকুম দিলেন। তৎক্ষণাৎ দলে দলে সৈন্য ছুটিল।

এদিকে অঙ্গদ একটু পূর্ব্বেই সব টের পাইয়া হীরক লইয়া বাড়ী থেকে পলাইয়া গেলেন। সৈন্যরা ইহা জানিতে পারিয়া তখনই রাজাকে খবর দিল। রাজা তখনই পাঁচশত ঘোড়-সওয়ার পাঠাইলেন তাঁকে ধরিয়া আনিতে। যদি তিনি স্বেচ্ছায় হীরক না দেন, তবে যেন তাঁকে বধ করা হয়, রাজা এ হুকুমও দিলেন।

অঙ্গদ যদিও অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন, তবু ঘোড়-সওয়াররা তাঁকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি বুঝিলেন যে, জগন্নাথের গলায় হীরক পরাইবার সাধ আর তাঁর মিটিল

না। কিন্তু কি করিবেন? অনেক ভাবিয়া তিনি ঘোড়-সওয়ারদের বলিলেন,—"তোমরা একটু অপেক্ষা কর ভাই,



আমি ঐ সামনের পুকুরটা থেকে ডুব দিয়ে আসি, তোমাদের কোন চিন্তা নাই।"

তারা রাজী হইল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুকুর পর্য্যন্ত গেল। তিনি পুকুরের মধ্যে খানিকটা নামিয়াই হীরকটি গভীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সওয়াররা 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। অনেকে তখনই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং ডুব দিয়া দিয়া খুঁজিতে লাগিল। পুকুরের জল তোলপাড় হইল বটে, কিন্তু হীরক আর পাওয়া গেল না।

সওয়াররা ফিরিয়া গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। সংবাদ শুনিয়া রাজা অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন।

এদিকে অঙ্গদ সেখান থেকেই শ্রীক্ষেত্রের দিকে চলিলেন। ঠাকুরকে হীরক পরানো হইল না বলিয়া তাঁর বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কয়েকদিন পর তিনি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শুদ্ধ-স্নাত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চাহিতেই তিনি দেখিলেন যে, ঠাকুরের গলায় সেই হীরকটিই ঝুলিতেছে। তিনি মুগ্ধবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, চোখের জলে যে বুক ভিজিয়া গেল তা টেরও পাইলেন না।

স্পর্শমণি

বৃন্দাবনে যমুনার তীরে বসিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী একমনে ধ্যান করেন। একদিন যমুনায় স্নান করিতে নামিয়াছেন, তাঁর পায়ে একটি স্পর্শমণি ঠেকিল। সেটি হাতে করিয়া তিনি ভাবিলেন,—'ভগবানের এ কি ছলনা! জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মায়া কাটিয়ে এসেচি, তবে আবার এ স্পর্শমণি তিনি আমায় দিলেন কেন? এ বোধ হয় তাঁরই পরীক্ষা। যাক্, ফেলে দিয়ে আর কি কর্‌ব, যদি কোন দীন-দুঃখীর উপকারে লাগে।'

এই ভাবিয়া তিনি নদীতীরের বালির মধ্যে স্পর্শমণি পুঁতিয়া রাখিলেন; তারপর স্নান শেষ করিয়া আবার ধ্যানে বসিলেন।

এদিকে বর্দ্ধমান জিলায় মানকর নামে এক গ্রামে জীবন নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি বড়ই দরিদ্র, অথচ তাঁর বহু পরিজন। কিছুতেই যখন তাঁর দুঃখ আর দূর হইল না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, কাশীতে গিয়া শিবের আরাধনা করিবেন। যদি দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁর দুঃখ দূর করেন, তবেই তিনি ফিরিবেন, নইলে পরিজন প্রতিপালনের আর যে কোন উপায় নাই।

কাশীতে আসিয়া তিনি একমনে শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবতা তাঁর তপস্যায় প্রীত হইয়া স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁকে বলিলেন,—

"যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধর দুটি পায়।
তাঁরে পিতা বলি' মেনো, তাঁরি কাছে আছে জেনো
ধনের উপায়!"

এই স্বপ্নাদেশ পাইয়াই জীবন বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং যমুনার তীরে গিয়া সনাতন গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি নাম? কোথা থেকে কিসের জন্যে আমার কাছে এসেচ?"

জীবন সব বলিলেন।

সনাতন বলিলেন,—"আমার কি আছে? কি ক'রে তোমার দুঃখ দূর কর্‌তে পারি?"

জীবন বলিলেন,—"দেবতা আমায় স্বপ্নে বলেচেন আপনিই আমার দুঃখ দূর কর্‌তে পার্‌বেন। এ কি মিথ্যা?"

একটু পরেই হঠাৎ সেই স্পর্শমণির কথা সনাতনের মনে পড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন,—"ঠিক বটে ঠিক। একদিন স্নান কর্‌তে গিয়ে স্পর্শমণি পেয়েচি। যদি কারু দুঃখ দূর হয় এই মনে ক'রে নদীতীরেই বালির মধ্যে পুঁতে রেখেচি!

তোমায় জায়গাটা ব'লে দিচ্ছি, খুঁড়ে নিয়ে দুঃখ দূর করগে।"

জীবন গিয়া বালি খুঁড়িয়া মণিটি তুলিতে না তুলিতেই তাঁর লোহার মাছুলি ছুটি সোনা হইয়া উঠিল। বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিলেন,—'এমন মণিকে যিনি তুচ্ছ মনে ক'রে ফেলে দিতে পারেন তিনিই দেবতা।'

স্পর্শমণিটি লইয়া জীবন চলিয়া আসিলেন সনাতনের কাছে; বলিলেন,—"ঠাকুর, দয়া ক'রে আমায় দীক্ষা দাও, তোমার দীক্ষায় আমার জীবন ধন্য হোক্।"

সনাতন বলিলেন,—"তোমার এ পথ নয়। এ পথে আস্তে হ'লে যে সবই ত্যাগ কর্তে হয়! তোমার হাতের স্পর্শমণি যদি অনায়াসে ফেল্‌তে পার, তবে তোমাকে আমার পথে নেব।"

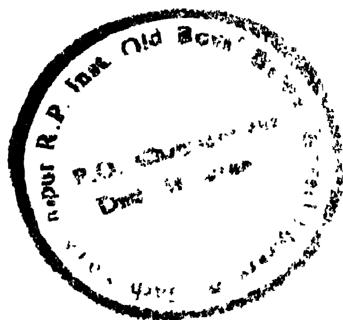
জীবন তখন

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে!" —এত বলি' নদীনীরে
ফেলিল মাণিক!

* * * *

এই স্পর্শমণির কথা ক্রমে ক্রমে বাদশাহের কানেও গেল। তিনি কতকগুলি লোক দিয়া একটি হাতী বৃন্দাবনে

পাঠাইয়া দিলেন। সনাতন যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে আসিয়া তাঁরা যমুনার জলে হাতী নামাইয়া দিয়া স্পর্শমণি খোঁজ করিতে লাগিল। নদীর জল তোলপাড় হইয়া গেল, কিন্তু মণি আর মিলিল না। হাতীটা যখন উঠিয়া আসিল তখন দেখা গেল তার পায়ের লোহার বেড়ী সোনা হইয়া গিয়াছে। বাদশাহের লোকেরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ফিরিয়া গেল।



অগতির গতি

—১—

এক ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে যেমনি উপক্রম করিয়াছে, অমনি দূর থেকে এক সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিয়া তাকে ধরিলেন। ব্রাহ্মণ জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া নদীতে পড়িতে চায়, আর সন্ন্যাসী ক্রমাগত তাকে বাধা দেন। এমনি করিয়া কিছুক্ষণ চলিল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ, তুমি কি পাগল হয়েচ? জান না আত্মহত্যা মহাপাপ?"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"আমার জীবনে ভয়ানক ঘেন্না ধ'রে গেচে। আমায় সকলে ঘেন্না করে। রাস্তায় বেরুলে সকলে স'রে যায়, আর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলাবলি করে, আমি ঘৃণিত পশু। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু আমায় কেউ ছোঁয় না, আমার সঙ্গে কথা কয় না। সমাজ বা মানুষের মধ্যে আমার স্থান নেই। এ জীবন রেখে আর কি হবে? ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমায় মর্‌তে দিন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"থাম না ব্রাহ্মণ, ব্যাপারটা কি একবার শুনি। দেখা যাক্ কোন প্রতীকার করা যায় কিনা।"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"মানুষের কিছু দোষ নেই ঠাকুর, আমিই মহাপাতকী। আমার কথা শুন্‌লে আপনিও আমায় ঘেন্না কর্‌বেন। এমন কোন অপকর্ম্ম নেই যা আমি করি নি,—

নরহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, কিছুই বাকী নেই। আমার জীবন সত্যিই পশুর জীবন, বোধ হয় পশুও আমার চেয়ে ভাল।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার তা হ'লে খুব অনুশোচনা হচ্ছে বল। পাপকে পূর্ব্বে পাপ ব'লে বুঝ্‌তে পার নি, এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছ ব'লেই এই অনুশোচনা হচ্ছে। তুমি জীবনে হতাশ হয়েচ। আমার কথা শোন। তুমি ভগবানে মনপ্রাণ দাও, তোমার সব পাপতাপ ধুয়ে মুছে যাবে। শোন নি দস্যু রত্নাকর সাধনা ক'রে বাল্মীকি হয়েছিলেন। জগতে চিরকাল ধ'রে তিনি পূজো পাচ্ছেন। ভয় নেই ব্রাহ্মণ, ভয় নেই। হতাশ হ'য়ো না। আমার সঙ্গে এস। আমি তোমায় আশ্রয় দেব, তোমায় আনন্দের পথ দেখিয়ে দেব।"

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেন আশার ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল,—নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই সন্ন্যাসীই জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ তুলসীদাস।

—২—

মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের কাছে সব মানুষই সমান—ছোট-বড়, ভালমন্দ নাই, সকলকেই তাঁরা সমান ভালবাসেন। ভগবান পাতিতকে উদ্ধার করেন বলিয়া তাঁর নাম পতিত-

পাবন। তাঁর প্রকৃত ভক্ত যাঁরা, তাঁরা পাপীকে ঘৃণা করেন না, বরং ভালবাসিয়া পাপ-পথ থেকে ফিরাইয়া আনিয়া প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলেন। মহাত্মা তুলসীদাসও ব্রাহ্মণকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া এমন করিয়া তুলিলেন যে, সে তুলসীদাসকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। সে যেন এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। এক ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা তার মনে স্থান পায় না। স্পর্শমণি যেমন লোহাকে সোনা করিয়া দেয়, তুলসীদাসও তেমনি তার অন্তর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিলেন।

তুলসীদাস তাকে লইয়া কাশীতে আসিয়াছেন। এদিকে কাশীর ব্রাহ্মণ-মহলে সোরগোল পড়িয়া গেল। তুলসীদাস চণ্ডালকেও কোল দেন, সুতরাং তিনিও অস্পৃশ্য, ইহা মনে করিয়া সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ তাঁকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তার উপর এই পাতকী ব্রাহ্মণটিকে লইয়া তিনি বিশ্বনাথের মন্দিরে যান; কাজেই সমাজপতিরা চটিয়া লাল। তাঁরা বলিলেন,—"এই ব্রাহ্মণ যে রোজ নৈবেদ্য নিয়ে মন্দিরে গিয়ে পূজো দেয়, যদি তার নৈবেদ্য বিশ্বনাথের ষাঁড় খায়, তবে ব্রাহ্মণকে আর তুলসীদাসকে মন্দিরে ঢুকতে দেব, নইলে কিছুতেই ঢুকতে দেব না।"

ব্রাহ্মণগণ মনে করিয়াছিলেন বিশ্বনাথের ষাঁড় পাথরের তৈয়ারী, সুতরাং পাথরের ষাঁড় নৈবেদ্য খাইবে কি করিয়া? তুলসীদাস এইবার জব্দ!

পরদিন তুলসীদাস ও সেই ব্রাহ্মণ নৈবেদ্য লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের ভয় হইল। তুলসীদাস বলিলেন,—"ভয় কি? রঘুনাথের কথা মিথ্যা হ'তে পারে না। তিনি আমায় ব'লেচেন এই পাথরের ষাঁড়ই জীবন্ত হ'য়ে নৈবেদ্য খাবে।"

ব্রাহ্মণ নৈবেদ্যের থালা ষাঁড়ের সাম্‌নে ধরিল, আর সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দেখিল যে, পাথরের ষাঁড়ই জিভ বাহির করিয়া নৈবেদ্য চাটিয়া খাইল।

ব্রাহ্মণগণ তখন তুলসীদাসের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। তারপর কাশীর ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিগণ তুলসীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।